আসাদ বিন হাফিজ

প্রকাশন

ক্রুসেড - ১২

গোপন বিদ্রোহী

আসাদ বিন হাফিজ

প্রীতি প্রকাশন
৪৩৫/ক বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোনঃ ৮৩২১৭৫৮, ০১৭১৭৪৩১৩৬০

ক্রুসেড - ১২

গোপন বিদ্রোহী

[আবদুল ওয়াজেদ সালাফী অনূদিত আলতামাশ-এর
'দাস্তান ঈমান ফারুশোকী'র ছায়া অবলম্বনে রচিত]

প্রকাশক

আসাদ বিন হাফিজ
প্রীতি প্রকাশন
৪৩৫/ক বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোনঃ ৮৩২১৭৫৮ ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২-৮৩১৯৫৪০

পঞ্চম মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারী ২০১২
প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী ২০০২
প্রচ্ছদ :
প্রীতি ডিজাইন সেন্টার
মুদ্রণ :
প্রীতি কম্পিউটার সার্ভিস

মূল্যঃ ৫০.০০

CRUSADE-12
Gopon Bidruhi
[A heroic Adventure of the great Salahuddin]
by: Asad bin Hafiz
Published by: Pritee Prokashon
435 / ka Bara Moghbazar, Dhaka-1217
Phone : 8321758, 8319540, 01717431360
Published on: Fabruary 2002
PRICE : 50.00 TAKA
ISBN 984-581-186-8

রহস্য সিরিজ ক্রুসেড

ক্রুসেডের ইতিহাস অনেক দীর্ঘ। হাজার বছর ধরে চলছে এ ক্রুসেড। গাজী সালাহউদ্দিন আইয়ুবী ক্রুসেডের বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন তা বিশ্বকে হতবাক করে দিয়েছিল। কেবল সশস্ত্র সংঘাত নয়, কূটনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সে যুদ্ধ ছিল সর্বপ্লাবী।

ইসলামকে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলার চক্রান্তে মেতে উঠেছিল খৃস্টানরা। একে একে লোমহর্ষক অসংখ্য সংঘাত ও সংঘর্ষে পরাজিত হয়ে বেছে নিয়েছিল ষড়যন্ত্রের পথ। মুসলিম দেশগুলোতে ছড়িয়ে দিয়েছিল গুপ্তচর বাহিনী। ছড়িয়ে দিয়েছিল মদ ও নেশার দ্রব্য। বেহায়াপনা আর চরিত্র হননের স্রোত বইয়ে দিয়েছিল মুসলিম দেশগুলোর সর্বত্র। একদিকে সশস্ত্র লড়াই, অন্যদিকে কুটিল সাংস্কৃতিক হামলা– এ দু'য়ের মোকাবেলায় রুখে দাঁড়াল মুসলিম বীর শ্রেষ্ঠরা। তারা মোকাবেলা করল এমন সব অবিশ্বাস্য শ্বাসরুদ্ধকর ঘটনার, মানুষের কল্পনাকেও যা হার মানায়।

আজ মুসলিম বিশ্বকে সমূহ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে আপনাকে জানতে হবে তার স্বরূপ। আর এ স্বরূপ জানতে হলে এ সিরিজের বইগুলো আপনাকে পড়তেই হবে

▼ গাজী সালাহউদ্দীনের দুঃসাহসিক অভিযান ▼ সালাহউদ্দীন আয়ুবীর কমাণ্ডো অভিযান ▼ সুবাক দুর্গে আক্রমণ ▼ ভয়ংকর ষড়যন্ত্র ▼ ভয়াল রজনী ▼ আবারো সংঘাত ▼ দুর্গ পতন ▼ ফেরাউনের গুপ্তধন ▼ উপকূলে সংঘর্ষ ▼ সর্প কেল্লার খুনী ▼ চারদিকে চক্রান্ত ▼ গোপন বিদ্রোহী ▼ পাপের ফল ▼ তুমুল লড়াই ▼ উমরু দরবেশ ▼ টার্গেট ফিলিস্তিন ▼ গাদ্দার ▼ বিষাক্ত ছোবল ▼ খুনী চক্রের আস্তানায় ▼ পাল্টা ধাওয়া ▼ ধাপ্পাবাজ ▼ হেমসের যোদ্ধা ▼ ইহুদী কন্যা ▼ সামনে বৈরুত ▼ দুর্গম পাহাড় ▼ ভন্ডপীর ▼ ছোট বেগম ▼ রক্তস্রোত ▼ রিচার্ডের নৌবহর ▼ মহাসমর

অপারেশন সিরিজ

বিশ্বব্যাপী চলছে ইসলামী পুনর্জাগরণ।
চলছে ইসলামবিরোধী শক্তির নির্যাতন
হত্যা-গুম-খুন-ষড়যন্ত্র।
মুক্ত বিশ্বের মানুষ তার অনেক খবরই জানতে পারছে।
কিন্তু চীনের অবস্থা?
ওখানে কি কোন মুক্তি আন্দোলন নেই?
চীনের মুসলমানদের ওপর কি কোন নির্যাতন চলছে না?

চলছে। কিন্তু সে খবর চীনের প্রাচীর ডিঙিয়ে
মুক্ত বিশ্বে আসতে পারছে না।
আর তাই দুনিয়ার মানুষ জানতে পারছে না
সেখানকার মুসলমানদের অবর্ণনীয় দুঃখ যন্ত্রণার কাহিনী।

তাওহীদুল ইসলাম বাবু
চীনের মুক্তিপাগল মানুষের
মরণপণ সংগ্রামের কাহিনী নিয়ে লিখেছেন
এক নতুন রহস্য সিরিজ– **'অপারেশন'**।

বেরিয়েছে অপারেশন সিরিজের বই

আতংকিত নানকিং ▼ সাংহাই সিটিতে রক্তস্রোত ▼ ব্ল্যাক আর্মির কবলে ▼ হাইনান দ্বীপে অভিযান ▼ অশান্ত চীন সাগর ▼ বিধ্বস্ত শহর ▼ ড্রাগনহিলের বিভীষিকা ▼ মৃত্যু দ্বীপ ▼ রক্তাক্ত প্রাচীর

সে রাতটি যদিও ছিল অমাবশ্যার, কিন্তু মিশরের আকাশ ছিল আয়নার মত স্বচ্ছ। আকাশে হীরার মতো জ্বলজ্বল করছিল অসংখ্য তারা। কোনটি উজ্জ্বল, কোনটি অপেক্ষাকৃত কম উজ্জ্বল। কোনটি খাঁটি মতির মতো চমকাচ্ছে।

কায়রো শহর গভীর নিদ্রায় মগ্ন। কেউ ভাবতেও পারেনি, কায়রোর এই শান্তিপ্রিয় ঘুমন্ত মানুষগুলোর ওপরই এক সময় শুরু হয়ে যাবে কিয়ামতের বিভীষিকা।

কায়রোর সেনাবাহিনী ও শহর রক্ষীরা ঘুমিয়ে ছিল। শুধু জেগেছিল কতিপয় টহলদার সৈনিক। কিন্তু তারা জেগে থাকলেও সতর্ক ছিল না। প্রতিদিনের মত নিশ্চিন্তে বসে বসে গল্পগুজব করছিল। হাতিয়ারগুলো পড়েছিল এক পাশে, অবহেলায়।

সীমান্ত রক্ষীরাও নির্বিকার। উত্তাপ ও উত্তেজনাহীন। একটি সাদামাটা দিন পার করে ক্যাম্প-খাটে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

নীলনদ সংলগ্ন ফাঁড়ির ডিউটিরত দুই প্রহরী শুধু এখনো পথে। নদীর তীর ধরে এগিয়ে চলেছে ওদের ঘোড়াগুলো। ঘোড়ার ওপর বিরহ কাতর চিত্তে বসে আছে দুই প্রহরী। এগিয়ে যাচ্ছে ওরা বণিক দলের সুন্দরী মেয়েদের কাছে।

পাশের ক্যাম্পটি এখান থেকে কয়েক মাইল দূরে, দুর্গম

পাহাড়ী অঞ্চলের কাছাকাছি। সে ফাঁড়ির সিপাইদেরও দায়িত্ব সীমান্তের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। কিন্তু শান্তিময় নিরুপদ্রব সময় সৈন্যদের অলস ও অকর্মন্য বানিয়ে দিয়েছিল, ফলে দায়িত্বের ব্যাপারে কেউ সচেতন ছিল না।

কয়েকটি নৌকা বোঝাই সুদানী হাবশী সৈন্য প্রবেশ করলো মিশরের মাটিতে। দুই ক্যাম্পের চার টহল সৈনিক তখন ডুবে আছে চার সুন্দরীর প্রেম সাগরে।

জোহরা ও তার সাথী নর্তকী তাদের তাবুতে শুয়েছিল। সঙ্গের পুরুষরা প্রকাশ্যে নিদ্রা গেলেও ভেতরে ভেতরে সবাই ছিল সজাগ, উৎকর্ণ ও সতর্ক। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তারা জানতে পেরেছে, আজকের রাতটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উপর থেকে নির্দেশ এসেছে, 'রাতে আহাম্মকের মত ঘুমিয়ে না থেকে সবাই সতর্ক থেকো।'

ওদের ওপর আরো নির্দেশ এসেছে, 'বাইরের কোন লোককে নদীর পাড়ে আসতে দেবে না। পাহাড়ী অঞ্চলের ধারে কাছেও ঘেঁষতে দেবে না কাউকে। যদি কেউ যেতে চায় তবে তাকে ধরে এনে বন্দী করে রাখবে।' বণিক ও বাদক উভয় দলের জন্য এই একই হুকুম ছিল।

অন্ধকার রাত। চাঁদ নেই আকাশে, মেঘও নেই। মেঘমুক্ত প্রকৃতি তারার আলোয় ঈষৎ আলোকিত। খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়েছে সবাই। অনেকক্ষণ পর এক বাজনাদার উঠে বসলো বিছানায়। তাবু থেকে বাইরে বেরিয়ে এদিক ওদিক ভাল করে

পরখ করে দেখলো। ক্যাম্পের চারদিকে চক্কর দিল একবার। এরপর জোহরা ও নর্তকী যে তাবুতে শুয়েছিল, ওখানে গেল। তাবু ফাঁক করে উঁকি দিলো ভেতরে, কিন্তু কিছুই দেখা গেল না।

লোকটি এদিক ওদিক চাইলো আবার। না, কেউ কোথাও নেই। চট করে ভেতরে ঢুকে গেল লোকটি। অন্ধকারে হাতড়িয়ে দেখলো বিছানায়। মনে হলো, যা সন্দেহ করেছিল তাই ঘটেছে।

আগুন জ্বাললো সে। দেখলো জোহরা নেই, সে পালিয়েছে।

অন্য মেয়েটি গভীর ঘুমে অচেতন। শুয়ে আছে এলোমেলো অবস্থায়। বাজনাদার তাকে আর জাগালো না। এ মেয়েকে জাগিয়ে কি লাভ? জোহরা কোথায় গেছে এ মেয়ের চাইতে ওইতো বেশী জানে! নিশ্চিত, পাশের ক্যাম্পের কমাণ্ডারের কাছে গেছে জোহরা। এ ছাড়া সে আর কোথায় যাবে?

জোহরা পালিয়েছে, এটা তেমন ভয়ের ছিল না। কিন্তু ভয়ের কারণ হলো, জোহরা যখন ফিরে আসবে তখন সাথে কমাণ্ডারও চলে আসতে পারে। প্রহরীদের না দেখলে কমাণ্ডার তাদের খোঁজাখুঁজি করবে। এমনও হতে পারে, সে নদীর তীরে চলে যেতে পারে।

যে খবর এতদিন বাইরের দুনিয়া থেকে গোপন রাখা হয়েছে, লুকিয়ে রাখা হয়েছে লোকচক্ষুর অন্তরালে, সে খবর ফাঁস হয়ে যেতে পারে মুহূর্তে!

বাজনাদার তার দুই সাথীকে জাগালো। তাদেরকে জানালো,

'জোহরা পালিয়েছে। নিশ্চয়ই সে ওই ক্যাম্পের কমাণ্ডারের কাছে গেছে।'

'বলো কি! যদি সে কমাণ্ডারকে নিয়ে ফিরে আসে!'

'তা আসতেই পারে। চলো এক কাজ করি। নদীর তীর থেকে দূরে ওদের আসার পথে ওঁৎ পেতে বসে থাকি। যদি কমাণ্ডার মেয়েটার সঙ্গে চলে আসে এবং আমাদের গোপনীয়তা প্রকাশ হয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দেয়, তবে দু'জনকেই ধরে আমাদের কমাণ্ডারের কাছে পৌছে দেবো।'

'তাই ভালো, চলো। যদি প্রয়োজন পড়ে তবে দু'জনকে হত্যা করে নদীতে ফেলে দেবো, কিন্তু কিছুতেই এ গোপনীয়তা ফাঁস হতে দেবো না।' আরেকটু উৎসাহ নিয়ে বললো সঙ্গী।

পাহাড়ের সেই দুর্গম অঞ্চল। বাইরে থেকে দেখে মনে হয় নিরেট এক পাথরের জগৎ, কিন্তু ভেতরের পরিবেশ সম্পূর্ণ আলাদা।

বিস্তীর্ণ এলাকা নিয়ে পাহাড়ী অঞ্চলটি দাঁড়িয়ে আছে যুগ যুগ ধরে। এলাকাটি দুর্গম বলে সেখানে মানুষের কোন যাতায়াত নেই। লোক চলাচলের পথ থেকেও অঞ্চলটি বেশ দূরে।

জনশ্রুতি আছে, এখানে ফেরাউনের প্রেতাত্মারা বাস করে। ফেরাউনরা যাদের হত্যা করেছিল তাদের প্রেতাত্মারাও নাকি বাস করে এখানেই। লোকেরা এ কথাও বলে, এ দু'ধরনের প্রেতাত্মারা মাঝে মধ্যেই এখানে যুদ্ধ বিগ্রহে জড়িয়ে পড়ে। কোন লোক এ এলাকায় ঢুকে পড়লে সে আর অক্ষত বেরিয়ে

আসতে পারে না। তার শরীর থেকে সব মাংস উধাও হয়ে যায়। কংকাল ছাড়া আর কিছুই থাকে না তার শরীরে।

বহুদিন আগের কথা। এ পাহাড়ী এলাকার বিভিন্ন পাহাড় কেটে ফেরাউনদের বড় বড় মূর্তি বানানো হয়েছিল। নিচ থেকে পাহাড় খুঁড়ে তার মধ্যে তৈরী করা হয়েছিল রাজকীয় মহল। এসব মহলে ছিল বড় বড় কামরা।

দীর্ঘদিন এ কামরাগুলোতে কোন মানুষ প্রবেশ করেনি। মহলগুলোও ছিল জনমানব শূন্য। প্রহরীদের দৃষ্টি এড়িয়ে এ কামরাগুলোতেই এসে আশ্রয় নিল সুদানী কুচক্রীরা।

যে রাতের ঘটনা, সে রাতে মাটির তলার এ মহল ও কামরাগুলোতে ছিল আলোর ছড়াছড়ি। হাজার হাজার হাবশী সেনার পদভারে সরগরম হয়ে উঠেছিল গোটা পার্বত্য অঞ্চল।

এ পাহাড়শ্রেণীর এক জায়গায় চারদিকে পাহাড় বেষ্টিত এক বিশাল মাঠ। মাঠটি ছিল মনোরম সবুজ ঘাসে ভরা।

ওখানে সমবেত করা হলো সুদান থেকে আনা নিগ্রো হাবশী যোদ্ধাদের। সবাই এসে সমবেত হলে হাবশীদের ধর্মগুরু চিৎকার করে বললো, 'উঁচু স্বরে কথা বলো না কেউ। একটু পরই তোমাদের সামনে হাজির হবেন তোমাদের ভগবান। মনের মধ্যে ভক্তি ও বিশ্বাস দৃঢ় করো। ভয় করো তার আক্রোশকে।'

ভয়ে ও আশংকায় কানে কানে কথা বলতেও ভুলে গেল লোকগুলো। সবচে বড় পাহাড়টার দিকে মুখ করে বসে ছিল

ওরা। পাহাড়টির নিচ থেকে চূড়া পর্যন্ত খোদাই করা এক বিশাল মূর্তি। আবু সাম্বালের মূর্তি বলে পরিচিত এটা।
হাবশীদের বলা হলো, 'এটাই তোমাদের ভগবানের মূর্তি। আজ এ মূর্তি মানুষের রূপ নিয়ে সবার সামনে উপস্থিত হবে।'
সহসা মেঘের গর্জনের মত গুরুগম্ভীর গর্জন ভেসে এলো। হাবশীরা আগে থেকেই চুপ করেছিল। এ গর্জন শোনার পর তাদের নি:শ্বাসও যেন বন্ধ হয়ে গেল। এরপরই ভেসে এলো আরও একটি আওয়াজ, 'ভগবান জেগে উঠছেন। সামনের পাহাড়ের দিকে তাকাও।'
গুরুগম্ভীর জোরালো কণ্ঠের ধ্বনি। পাহাড়ে ও উপত্যকায় এ ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হলো বার বার।
এরপরই আকাশে দেখা গেলো দুটো উড়ন্ত অগ্নিশিখা। শিখা দুটো পাহাড়ের দিকে এগিয়ে গেল এবং পাহাড়ের সাথে ধাক্কা খেলো। সাথে সাথে সেখান থেকে ছড়িয়ে পড়লো সহস্র আগুনের টুকরো। এ অগ্নিশিখায় আলোকিত হয়ে উঠলো আবু সাম্বালের মূর্তি।
মূর্তির মুখের ওপর ছড়িয়ে পড়লো আলো। দেখা গেলো, সে বিশাল মূর্তির চোখ মিটিমিটি করছে। তার মুখ বার বার খুলছে ও বন্ধ হচ্ছে। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার, সবারই মনে হলো, মূর্তির মুখ ডানে বায়ে দুলছে।
হাবশীগুলোর ধর্মগুরু ভক্তিতে সিজদায় পড়ে গেল। তার দেখাদেখি সিজদায় লুটিয়ে পড়লো মাঠে সমবেত হাজার

হাজার নিগ্রো সৈন্য।
ধর্মগুরু একটু পর সিজদা থেকে মাথা তুলে বললো, 'সবাই ভগবানের কাছে মন খুলে প্রার্থনা করো।'
লোকগুলো সিজদা থেকে মাথা তুললো। দু'হাত প্রসারিত করে প্রার্থনা জানাতে লাগলো ওরা।
ধর্মগুরু উচ্চস্বরে বলতে লাগলো, 'হে আগুন ও পানির খোদা! মরুভূমির তপ্ত বালুর খোদা! নদীতে পানি দেয়ার খোদা! আমরা তোমাকে দেখেছি। তুমি আমাদেরকে বলে দাও, তোমার পদতলে আমরা কত মানুষ বলী দেবো। পুরুষ দেবো, না নারী দেবো?'
'একটি পুরুষ ও একটি নারী।' পাহাড়ের দিক থেকে শব্দ হলো, 'তোমরা এখনও আমাকে দেখোনি। আমি মানুষের রূপ নিয়ে তোমাদের সামনে আসছি। যদি তোমরা আমার শত্রুদের শেষ না করো, তবে তোমাদের সকলকে এ পাহাড়ের পাথর বানিয়ে রাখবো। তোমরা চিরদিন রৌদ্রে পুড়তে থাকবে। তোমাদের মধ্যে যারা যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পলায়ন করবে, মরুভূমির বালু তাদের রক্ত চুষে নেবে। তোমরা অপেক্ষা করো, একটু পরই আমি দর্শন দেবো তোমাদের।'
সারা মাঠে পিনপতন নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। অগ্নিশিখা ধীরে ধীরে কমে আসতে লাগলো। পাহাড়ের মধ্যে হাবশীদের ধর্মীয় সঙ্গীত বেজে উঠলো। বহু লোকের সমবেত কণ্ঠের এ সঙ্গীত। এ সঙ্গীত শুধু তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানেই বাজানো হয়। কণ্ঠের সাথে পাল্লা দিয়ে বাজছিল ঢোল তবলা, এটাই রীতি।

নীচে বসে হাজার হাজার হাবশী মুগ্ধ বিস্ময়ে শুনছিল এ সঙ্গীত। চারদিকে পাহাড় বেষ্টিত খোলা মাঠে বসে রাতের এ আবছা অন্ধকারে গান শুনতে শুনতে ওদের মনে হচ্ছিল, ওরা কোন অদৃশ্যলোকে পৌঁছে গেছে। অপার্থিব কোন জগত থেকে ভেসে আসছে হৃদয় মথিত করা গান।

জোহরা বসেছিল কমাণ্ডারের তাবুতে। তার কণ্ঠে উচ্ছ্বসিত আবেগের জোয়ার। সে কমাণ্ডারকে বলছিলো, 'যদি আমি তোমাকে না দেখতাম তবে সারা জীবন নেচে গেয়ে, অন্যের মনতুষ্টি করেই হয়তো কাটিয়ে দিতাম। তোমাকে দেখার পর থেকে মনে হচ্ছে, আমি এক বাপের আদরের মেয়ে, কোন অসভ্য নির্লজ্জ নর্তকী নই। যদি আজ হঠাৎ কোন কারণে তুমি মারা যাও, মনে করবো আমার বাবা মারা গেছেন। আমি আবার নতুন করে এতীম হয়ে যাবো।
যারা আমাকে নর্তকী হিসাবে ভাড়া এনেছিল তাদের সাথে আমার লেনদেন শেষ হয়ে গেছে। আর আমি ফিরে যাবো না ওদের কাছে।
ওরা হয়তো আমাকে আমার মালিকের হাতে ফিরিয়ে দিতে চাইবে। কিন্তু আমি আর তার কাছেও ফিরে যেতে চাই না। এখন থেকে আমি এখানেই থাকবো। আমি আমার বাবার কাছে থাকবো।'
'দুর পাগলী! এটা সেনা ক্যাম্প না! এখানে তো তোকে রাখা যাবে না।'

'যদি আমাকে এখানে রাখতে অসুবিধা হয়, তবে আমাকে তোমার গ্রামের বাড়ী পাঠিয়ে দাও।' জোহরা জেদ ধরে বললো, 'যদি আশ্রয় দিতে না পারো তবে আমাকে মেরে ফেলো, কিন্তু আমাকে ফিরে যেতে বলো না, কিছুতেই আমি আর ফিরে যাবো না।'

'না জোহরা, অবুঝ হয়ো না। এমন জেদ করো না, যা রক্ষা করা আমার সাধ্যের অতীত।' কমাণ্ডার বললো, 'এখন তুমি ফিরে যাও। আমি ওয়াদা করছি, তোমাকে তোমার বাড়ী পৌছে দেয়ার ব্যবস্থা করবো। তুমি তোমার কায়রোর ঠিকানা দিয়ে যাও আমাকে। যখন আমি ছুটি পাবো তখন তোমাকে সেখান থেকে আমাদের বাড়ীতে নিয়ে যাবো।'

কিছুতেই রাজি হচ্ছিল না জোহরা। অবশেষে অনেক বলে কয়ে জোহরাকে ফেরত যেতে রাজি করালো কমাণ্ডার।

কিছুক্ষণ পর। কমাণ্ডার দুটো ঘোড়া প্রস্তুত করে জোহরাকে বললো, 'চলো, তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।'

ঘোড়ার ওপর চড়ে বসলো ওরা। চলতে শুরু করলো ঘোড়া।

জোহরা কমাণ্ডারকে জিজ্ঞেস করলো, 'রাতের অন্ধকারে এখানে এত নৌকা আসে কেন? দিনের বেলা তো এত নৌকা দেখি না!'

'কি! নৌকা?' কমাণ্ডার আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলো 'কোন দিক থেকে আসে?'

'ওই দিক থেকে।' সে সুদানের দিকে ইঙ্গিত করলো।

'তুমি জানলে কি করে?'

'ইদানিং রাতে আমার ঘুম আসে না। কখনো কখনো মাঝ রাতে বিছানা থেকে উঠে তাবুর বাইরে গিয়ে বসে থাকি।

আপনার এখান থেকে বিদায় নিয়ে প্রথম যেদিন নদী পারের ক্যাম্পে গিয়ে উঠলাম, কিছুতেই ঘুম আসছিল না। রাতে পালিয়ে আপনার কাছে ছুটে এলাম। ভোর রাতে আপনি যখন আমাকে পৌঁছে দিলেন, ফিরে দেখি সেই ক্যাম্পের এক লোক না ঘুমিয়ে বসে আছে।

আমাকে সে জেরা করলো, কোথায় গিয়েছিলাম, কেন গিয়েছিলাম, ইত্যাদি। আমি নদীর পাড়ে হাঁটতে গিয়েছিলাম বলে তাকে এড়িয়ে গেলাম।

সে আমাকে শাসিয়ে বললো, তাকে না জানিয়ে যেনো ক্যাম্পের বাইরে কোথাও না যাই।

কিন্তু পরদিন ঘুম না আসায় মাঝ রাতে তাবুর বাইরে এলাম। দেখলাম, ওখানকার কাণ্ডকারখানা। প্রথম রাতে দেখলাম তিনটি, পরের রাতে দু'টি বিরাট বিরাট পাল তোলা নৌকা এসে কূলে ভিড়লো। নৌকার সাদা পাল রাতের অন্ধকারেও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল।

নৌকাগুলো নদীর পাড়ে লাগলে বহু লোকের গুঞ্জন শোনা গেল। আমি অন্ধকারে লুকিয়ে এগিয়ে গেলাম নদীর ঘাটের দিকে। তাকিয়ে সব দেখলাম।'

'কি দেখলে?' বিস্মিত কমাণ্ডার প্রশ্ন করলো।

'দেখলাম নৌকা থেকে বহু লোক নেমে এল। এরপর তারা

গাছের তল দিয়ে হেঁটে সোজা পাহাড়ের দিকে চলে গেল এবং পাহাড়ের মধ্যে সবাই অদৃশ্য হয়ে গেল।'

'তুমি কি আমাদের দু'জন সিপাইকে টহল দিতে দেখোনি?' কমাণ্ডার জিজ্ঞেস করলো, 'তারা ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে টহল দেয়। তাদের ডিউটি থাকে এই নদীর পাড়ে।'

'না!' জোহ্‌রা উত্তর দিলো, 'আমি কখনও কোন সিপাইকে এখানে ডিউটি দিতে দেখিনি। দিনের বেলা দু'জন সিপাই আসে, কাফেলার ক্যাম্পেই তারা আহার-নিদ্রা করে। একদিন আমি এক সিপাইকে একটি মেয়ের সাথে আপত্তিকর অবস্থায় দেখেছি। ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে ওরা হাঁটতে হাঁটতে পাহাড়ের আড়ালে হারিয়ে হয়ে গেল।'

জোহ্‌রার জানা ছিলা না সীমান্তে কি কাণ্ডকারখানা চলছে আর কি হতে যাচ্ছে। সীমান্ত প্রহরীদের দায়িত্ব সম্পর্কেও তার কোন জ্ঞান ছিল না। তার এটাও জানা ছিল না, রাতে বা দিনে সুদানীদের নৌকা এদিকে আসা উচিত কি অনুচিত। সে সরল মনে যে প্রশ্ন করেছে, কমাণ্ডারের জন্য তার মধ্যে ছিল ভয়ংকর গুরুত্বপূর্ণ খবর। জোহ্‌রা যা বলেছে তা যদি সত্যি হয়ে থাকে, তবে সে অত্যন্ত জরুরী ও অতি গোপনীয় এক তথ্যই সরবরাহ করেছে।

জোহ্‌রার কথায় কমাণ্ডার চমকে সজাগ হয়ে উঠলো। জোহ্‌রাকে বললো, 'এসো, আজ এ নদীর পাড়েই ঘুরে বেড়াই।'

তারা নদীর পাড়ে গিয়ে পৌছলো। নদীর তীর ধরে পাশাপাশি

ধীরে ধীরে চলতে লাগলো ওরা। কমাণ্ডারের দৃষ্টি নদীর উপরে ছুটে বেড়াতে লাগলো।

ওরা পথ চলছিল নদী পাড়ের রাস্তা ধরে। রাস্তাটা বৃক্ষের ছায়ায় বেশ অন্ধকার। হঠাৎ নদীর মাঝে একটু আলোর আভা দেখা গেল। মনে হলো কোন লণ্ঠনের আলো। পরে আরও একটি আলো দেখা গেল। তারপর অকস্মাৎ দুটো আলোই এক সঙ্গে নিভে গেল।

এদিকে নদীর কুলেও একটি আলো জ্বলে উঠেই সঙ্গে সঙ্গে আবার নিভে গেল। কমাণ্ডার কোথাও প্রহরীদের দেখতে পেলো না।

কমাণ্ডার নদীর তীর থেকে একটু উপরে যেখানে প্রহরীদের সেন্ট্রি রুম, সেখানে গেল। নাম ধরে ডাকলো সিপাইদের, কিন্তু কোথাও তাদের কোন সাড়া নেই। কমাণ্ডার আবারো উচ্চস্বরে ডাকলো, তবুও কোন উত্তর পাওয়া গেল না।

জোহরাকে নিয়ে কমাণ্ডার সতর্কতার সাথে আবার নিচে নেমে এলো।

সামনে নদীতে দুটো নৌকার সাদা পাল দেখা যাচ্ছে। কমাণ্ডার অধীর হয়ে উঠলো। তার সাথে যে জোহরা নামের একটি মেয়ে আছে সে কথাও বেমালুম ভুলে গেল।

সে দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে গেল সামনে। জোহরাও তার পেছন পেছন ঘোড়া ছুটালো। কমাণ্ডার ছুটছে আর সিপাইদের ডেকে যাচ্ছে চাপা স্বরে।

ডিউটিতে আসা সৈন্য দু'জন তখন পাহাড়ের আড়ালে

অভিসারে মত্ত। হঠাৎ তাদের কানে কমাণ্ডারের ডাক পৌঁছলো। তারা দ্রুত সেখান থেকে উঠে ছুটে গেল যেখানে তাদের ঘোড়া রেখেছিল, সেখানে।
যেখানে তাদের ঘোড়া বাঁধা ছিল সেখানে গিয়ে দেখলো দুটো ঘোড়াই গায়েব হয়ে গেছে। তারা সেখানে দাঁড়িয়ে রইলো। তাকিয়ে দেখলো, দূরে কারা যেন তাদের ঘোড়া নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে।

কমাণ্ডারের ঘোড়া আগে, জোহরার ঘোড়া পিছনে, দু'জনই ছুটছে সমানে। হঠাৎ অন্ধকার থেকে কে যেন বললো, 'তুমি যাদের ডাকছো তারা অনেক আগে চলে গেছে।'
'তোমরা কে?' কমাণ্ডার জিজ্ঞেস করলো, 'সামনে এসো!'
'আমরা মুসাফির মানুষ!'
অন্ধকার থেকে দুটো ঘোড়া কমাণ্ডারের দিকে এগিয়ে এলো। কমাণ্ডার তলোয়ার বের করলো।
'রাতে কোন মুসাফিরের অশ্বে আরোহণ এবং সীমান্তে সন্দেহজনক ঘোরাঘুরির মানে জানো তোমরা?' কমাণ্ডার ওদের চ্যালেঞ্জ করলো।
ওরা কমাণ্ডারের কাছে এসে থেমে গেল। একজন বললো, 'ওদিকে দেখুন, ওরা আসছে।'
যখনই কমাণ্ডার সেদিকে তাকিয়েছে, লোক দু'জন হঠাৎ আক্রমণ করে বসলো তার ওপর। ধাক্কা দিয়ে তাকে ফেলে দিতে চাইল ঘোড়া থেকে। পতন ঠেকাতে হাতিয়ার ফেলে

ঘোড়ার পিঠ খামচে ধরলো কমাণ্ডার।

লোক দু'জন জাপটে ধরল তাকে। এমন শক্ত ভাবে চেপে ধরলো, তার নড়ারও ক্ষমতা রইল না।

একজন দ্রুত পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলল কমাণ্ডারকে। এরপর ছুটল মেয়েটার উদ্দেশ্যে। দ্রুত তাকেও বেঁধে ফেলল।

যে লোক কমাণ্ডারকে ধরে রেখেছিল সে ঘোড়াকে তাড়া দিল এগিয়ে যাওয়ার জন্য।

ঘোড়া যখন চলতে শুরু করলো, ঘোড়া থেকে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলো কমাণ্ডারের। অন্ধকারের মধ্য থেকে বেরিয়ে এল আরও একজন। সে কমাণ্ডারের ঘোড়ায় চড়ে বসে তাকে ধরে থাকলো।

জোহরা চিনতে পারলো, এরা সেই বাজনাদার, যারা তাকে ভাড়া করে এনেছিল। আসলে এরা ছিল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সুদানী কমাণ্ডো সৈন্য। কমাণ্ডারের ডাক-চিৎকারে ওরা সতর্ক হয়ে গিয়েছিল এবং অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে জোহরা ও কমাণ্ডারকে আটক করতে সক্ষম হলো।

প্রহরীদের ঘোড়া এরাই চুরি করেছিল। সেই ঘোড়ায় চড়ে কমাণ্ডার ও জোহরাকে নিয়ে এগিয়ে চললো ওরা।

তাদের মধ্য থেকে একজন বলে উঠলো, 'এদেরকে জীবিত নিয়ে চলো। উপর থেকে আদেশ আছে, কোন সন্দেহজনক লোক পেলে জীবিত ধরে নেয়ার।'

কমাণ্ডার ও জোহরাকে নিয়ে তারা পাহাড়ের দিকে রওনা দিলো। নদীর ঘাট থেকে রওনা হওয়ার সময় কমাণ্ডার

দেখলো, নৌকার মধ্য থেকে কালো হাবশীরা দল বেঁধে নেমে আসছে। সঙ্গে প্রচুর যুদ্ধাস্ত্র ও খাদ্যসামগ্রী।

দুর্ভেদ্য দূর্গের মত পাহাড়ী অঞ্চলের ভেতর হাজার হাজার হাবশী অপলক চোখে তাকিয়ে আছে আবু সাম্বালের মূর্তির দিকে। ধীরে ধীরে উড়ন্ত আলোর শিখাগুলো নিভে এলো।
ধর্মীয় সঙ্গীতের মোহময় সুর ক্রমাগত বেজে চলেছে। সেই সুরের মুর্ছনা আঘাত হানছে হাবশীদের হৃদয়তন্ত্রীতে। যাদুর মত তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ছে রক্ত কণিকায়। সে প্রভাবে উদ্বেলিত ও উত্তেজিত হয়ে উঠছে ওদের হৃদয়গুলো। অন্তরে খেলা করছে অজানা শিহরণের বিমুগ্ধ স্রোত।
যে অল্প ক'জন হাবশী নিজ চোখে ভগবানকে দেখার দুর্লভ সৌভাগ্য পাচ্ছে, নিজেকে তাদের একজন ভেবে গর্ব ও অহংকারে স্ফীত হয়ে উঠছে বর্বর হাবশীদের বুকগুলো। ওরা নিজেদেরকে এখানে অনুপস্থিত হাবশীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও সৌভাগ্যবান ভাবতে লাগলো।
এক সময় থেমে গেল পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি তোলা সঙ্গীতের সেই সুর। তখনি পাহাড়ের ওপর আবার দেখা গেল বিদ্যুতের চমক। মনে হলো আকাশ থেকে গড়িয়ে পড়ছে সোনালী বিদ্যুতের কণা। এক সময় তা আবার এসে স্থায়ী হলো মূর্তির সম্মুখভাগে। আলোয় আলোময় হয়ে গেল মাথার ওপরের আকাশ।
আবু সাম্বালের মূর্তির ওপর কোত্থেকে এলো এই আলো, কেউ

জানতে পারলো না। মনে হচ্ছিল, অপার্থিব এ আলো ঠিকরে পড়ছে আবু সাম্বালের মূর্তি থেকে। নিজের আলোতেই তার চেহারা আলোময় হয়ে উঠেছে।

হঠাৎ আলো নিভে গেল! একটু পর আবার যখন সেখানে আলো ফুটলো, দেখা গেল, আবু সাম্বালের মুখ দিয়ে একজন লোক বেরিয়ে এসে মূর্তির বিশাল ঠোঁটের কার্ণিশে দাঁড়িয়ে আছে।

তার পিছনে এসে দাঁড়াল আরও চারজন লোক। ধবধবে সাদা চাদরে ঢাকা লোকগুলোর শরীর। কাঁধ থেকে পা পর্যন্ত সমস্ত শরীরই সেই চাদরের নিচে। শুধু মুখগুলো আবরণ মুক্ত।

সামনের লোকটিকে সম্রাটের মত দেখাচ্ছিল। তার মাথায় রাজ মুকুট। রাজ মুকুটের ওপর সাপের এক বিশাল ফণা। সেই ফণা থেকে আগুনের হল্কা বেরুচ্ছে। সে আগুনের হল্কার আলো এসে পড়ছে সম্রাটের গায়ের ওপর।

কোত্থেকে কেমন করে এই আলো আসছে কেউ বুঝতে পারল না। কিন্তু সেই আলো তার গায়ের তারকাখচিত কাপড়ে যখন পড়ছিল, তখন তা চমকাচ্ছিল দ্যুতি ছড়িয়ে।

তার এক হাতে বর্শা ও অন্য হাতে খোলা তলোয়ার। আলোতে তলোয়ারও চমকাচ্ছিল। সাদা চাদর পরা লোকগুলো তার পেছনে দাঁড়িয়ে রইল।

পিনপতন নীরবতা মাঠ জুড়ে। ভয় আর মুগ্ধতার আবেশে নিথর হয়ে আছে লোকগুলো।

সেই নীরবতা খান খান হয়ে গেল পেছনের চার সাদা

চাদরওয়ালার গুরুগম্ভীর উচ্চ রবে, ‘ভগবান নেমে এসেছেন মাটির পৃথিবীতে! খুব ভাল করে দেখে নাও তাকে। তারপর সিজদায় লুটিয়ে পড়ে প্রার্থনা করো তার কাছে।’

মাঠের দশ হাজার হাবশী সৈন্য একসাথে সিজদায় পড়ে গেল।

একটু পর আবার শোনা গেল গুরুগম্ভীর ধ্বনি, ‘মাথা উঠাও, ভাল করে দেখে নাও ভগবানকে।’

সেজদা থেকে মাথা তুলল লোকগুলো। ভক্তিমাখা চোখে তাকালো ভগবানের দিকে।

ভগবান তার তলোয়ার উর্ধে তুলে ধরে পাথরের সাথে আটকে রাখা অদৃশ্য রশির মই বেয়ে মূর্তির পায়ের পাতায় এসে দাঁড়াল। তার দেখাদেখি নেমে এলো তার সঙ্গীরাও। উপস্থিত লোকগুলোর মনে হলো পাহাড়ের চূড়া থেকে ওরা উড়ে পাতালে নেমে এসেছে।

মূর্তির পায়ের পাতা দুটো বিশাল এবং উঁচু মঞ্চের মত দেখাচ্ছিল মাঠ থেকে। যেমন মঞ্চ বানানো হয় কোন মাঠে সভা করার সময়। লোকগুলো বসেছিল সেই মঞ্চের সামনে। সারা মাঠ ছিল অন্ধকার। কিন্তু ভগবান ও তার সঙ্গীদের ওপর কোত্থেকে যেন কোমল আলো এসে ছড়িয়ে পড়ছিল। সেই আলোয় সৈনিকরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল তাদের।

এ সময় সবাইকে বিস্মিত ও অবাক করে চারজন অপ্সরী সেই আলোতে প্রবেশ করলো। তাদের পরণে পাতলা ঘাগরা। পিঠে পরীর মত দুই ডানা। মাথার চুলগুলো খোলা।

মেয়েরা পরীর মত উড়ার ভঙ্গিতে ভগবানের চারপাশে নৃত্যের তালে তালে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যেতো আবার খানিক বাদে ছুটে আসতো নাচতে নাচতে। নাচের তালে তালে উড়তো ওদের মাথার চুল, পরীর ডানা।

পাহাড়ে যখন ভগবানের এই খেলা ও লীলা চলছিল ঠিক সে সময় চারজন লোক কমাণ্ডার ও জোহরাকে নিয়ে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলো।

তারা পর্বতের ভেতর ফেরাউনদের তৈরী মহলের এক কামরায় ওদের বন্দী করে রেখে একজনকে বাইরে পাঠিয়ে দিল। একটু পর সে অন্য একজনকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলো বন্দীদের কাছে।

'এ লোক মিশরের বর্ডার ক্যাম্পের কমাণ্ডার আর মেয়েটি আমাদের ভাড়া করা নর্তকী। যখন আমাদের নৌকা থেকে হাবশীরা তাদের মালসামান ও রসদপত্র নামাচ্ছিল, তখন নদীর পাড়ে ওদের পেয়ে ধরে নিয়ে এসেছি।' নবাগত লোকটিকে বললো সে।

কমাণ্ডার ও জোহরাকে ভাল করে দেখলো লোকটি। তার মুখে ফুটে উঠলো হাসি। বললো, 'তুমি এদেরকে ঠিক সময়েই নিয়ে এসেছো। এই জংলী হাবশীরা মানুষের কোরবানীর জন্য পাগল হয়ে উঠেছে। আমরাও আলকিন্দির আদেশে ঘোষণা দিয়েছি, 'ভগবানের আদেশ মত একজন পুরুষ ও একজন নারীকে কোরবানী দেয়া হবে।' আমার ওপর হুকুম ছিল,

‘যেখান থেকে পারো একটি পুরুষ ও একজন নারীকে ধরে এনে দাও।’ আমি এখন মানুষ খোঁজার বিপদ থেকে বেঁচে গেলাম। ভালই হলো। তোমরা এক কঠিন সমস্যার সমাধান করে দিয়েছো, এ জন্য তোমাদেরকে ধন্যবাদ।’

‘মনে হচ্ছে আমরা সফল হবো, কারণ প্রতিটি কাজেই আমরা ভাগ্যের সহায়তা পাচ্ছি। এত সহজে কোরবানী সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে ভাবতেও পারিনি।’ বললো অন্যজন।

একজন বললো, ‘হাবশীদের খুব শখ ছিল তাদের ভগবানকে দেখার। তাদের সে শখও পূরণ হয়েছে।’

‘আমরা হাবশীদের ভগবানকে কি কৌশলে দেখিয়েছি, তা যদি দেখতে, তবে তুমিও তার ভক্ত হয়ে যেতে।’

‘দেখার বড় লোভ ছিল, কিন্তু তা আর পারলাম কই? নিশ্চয়ই খুব জমকালো অনুষ্ঠান হয়েছে?’

‘হ্যাঁ, পুরো অনুষ্ঠানটার দায়িত্ব ছিল এণ্ডারসনের ওপর। ওর কাজকর্ম তো তুমি জানোই, সব কাজই সে খুব নিখুঁত ও দক্ষতার সাথে করে।

প্রথমে সামনের পাহাড় থেকে দু'টি তীর নিক্ষেপ করে। তীর দুটোতে ছিল অগ্নিশিখা। তীর দুটো যেখানে পড়ে সেখানে এবং তার আশেপাশে আগেই তেল ও পেট্রোল জাতীয় বস্তু ছড়িয়ে রাখা হয়েছিল। তীর দুটো পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে আগুন ধরে গেল। মূর্তির মুখ আলোকিত হয়ে উঠল তাতে। এণ্ডারসন কেমন করে জানিনা, সে আলোয় এমন একটি ভাব এনে দিল, মনে হলো, মূর্তিটি হাসছে, নড়াচড়া করছে।

আলোর কারসাজিতে আমরাও দেখলাম, মূর্তিটির চেহারা ডানে বায়ে নড়াচড়া করছে।'

'এরপর কি হলো? হাবশীদের মাঝে এর কি প্রতিক্রিয়া দেখা গেল?' আগ্রহের সাথে জানতে চাইল সে।

'তারা সবাই সিজদায় পড়ে গেল। এদিকে আস্তে আস্তে আলো নিভে গেল। আমরা আবার পেট্রোল ঢাললাম পাহাড়ে, মূর্তির গায়ে। হাবশীরা ভয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে বসে কাঁপছিল। অন্ধকারে আমরা আলকিন্দিকে পোশাক পরিয়ে মূর্তির কোলে বসিয়ে দিলাম। তার সঙ্গী হলো চারজন।

মূর্তির উপরে 'সামেন' পাহাড় থেকে অত্যন্ত সফল ভাবেই আলো নিক্ষেপ করা সম্ভব হয়েছিল। নিচে থেকে সামেন পাহাড়ের অগ্নিশিখা দেখতে পাচ্ছিল না কেউ, একটি বিরাট আয়নার সাহায্যে সেই আলো ফেলা হলো মূর্তির ওপর। আলোর কিরণে আলোকিত মূর্তি দেখে মনে হচ্ছিল, এ আলো মূর্তির নিজস্ব আলো।

তারপর আলকিন্দি যখন ভগবান সেজে দেখা দিল তখন আমাদের মেয়েরা স্বর্গের অপ্সরী সেজে তার চারপাশে এমনভাবে নাচলো, মনে হলো আমরা তখন স্বর্গেই আছি। এখন আলকিন্দি মূর্তির পায়ের পাতার মঞ্চে দাঁড়িয়ে আছে। তার সামনে দিয়ে সবাই নত হয়ে হেঁটে যাবে। তাদেরকে বলতে হবে, ভগবান স্বয়ং যুদ্ধের নেতৃত্ব দেবেন।'

'বন্দী কমাণ্ডার ও জোহরাকে কি আজই কোরবানী করা হবে?'

'সে সিদ্ধান্ত হাবশীরাই নেবে। সম্ভবত তারা দু'চারদিন

তাদেরকে পেলে পুষে বশ মানাবে। তাদের কিছু ধর্মীয় নিয়ম পদ্ধতি পালন করাবে।'

তাদের কথার মাঝখানেই কিছু লোকের পদধ্বনি ও হাসির শব্দ কানে এল। ওরা তাকিয়ে দেখলো, আলকিন্দি ও তার চার সাথী এগিয়ে আসছে।

আলকিন্দি কাছে এলে ওরা বললো, 'একজন পুরুষ ও একজন নারীকে হঠাৎ হাতে পাওয়া গেছে। এ দু'জনকেই বলীর জন্য হাবশীদের হাতে সমর্পণ করা যেতে পারে।'

আলকিন্দি জিজ্ঞেস করলো না, মানুষ দু'টি কে বা কারা। সে মাথা থেকে রাজমুকুট নামিয়ে বন্দীরা যে কামরায় ছিল সেখানে প্রবেশ করল। কমাণ্ডার ও জোহরা বন্দী অবস্থায় চুপচাপ বসেছিল সেখানে। কমাণ্ডারের পরণে সামরিক পোশাক ছিল না, আলকিন্দি তাকে চিনতে পারল না। কিন্তু কমাণ্ডার আলকিন্দিকে ঠিকই চিনতে পারল।

কামরার বাইরে লোক দু'জন যখন ওদের নিয়ে আলাপ করছিল তখনও কয়েকবারই কমাণ্ডার আলকিন্দির নাম শুনেছিল। তাকে দেখতে পেয়ে তাই কমাণ্ডার খুব অবাক হয়নি, কিন্তু তিনি এখানে কি করছেন সে বুঝতে পারল না।

আলকিন্দি কামরা থেকে বেরোতে বেরোতে বলল, 'ঠিক আছে, ওদেরকে হাবশীদের ধর্মীয় নেতার কাছে তুলে দাও।'

আলকিন্দির এ কথায় কমাণ্ডার নিশ্চিত হয়ে গেল, তাকে ও জোহরাকে কোরবানী দেয়ার ফায়সালা চূড়ান্ত হয়ে গেছে।

আলকিন্দি বেরিয়ে গেলে একজন বললো, 'কমাণ্ডারের

ভাগ্যটাই খারাপ, নইলে বলীর পাঠা সেই হতে যাবে কেন?'
'আরে রাখো, এ তো সবে শুরু। এই বলী যখন হাবশীদের পাগল করে তুলবে রক্তের জন্য, তখন তো কায়রোর সব কমাণ্ডারই বলীর পাঠা হয়ে যাবে।' বললো তার সঙ্গী।
এ কথা শুনে সঙ্গীটি অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল।

তিন চারদিন পর।
কায়রোতে সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর ভাই তকিউদ্দীন আলী বিন সুফিয়ানকে ডেকে বললেন, 'তিন চারদিন যাবত সেনাপতি আলকিন্দির কোন খোঁজ নেই। আমি যখনই তাকে ডেকে পাঠাই তখনি উত্তর আসে, তিনি বাসায় নেই। তার মহলের ভেতর থেকেও উত্তর আসে, তিনি নেই। তবে সে যায় কোথায়? সীমান্ত পরিদর্শনে গেলে, আপনার অনুমতি না নিয়ে যাওয়ার কথা নয়। তাহলে সে গেল কোথায়?'
আলী বিন সুফিয়ান উত্তর দিলেন, 'কি বলছেন! তবে কি শত্রুদের সন্ত্রাসী গ্রুপের হাতে ধরা পড়েছে সে!'
'ধরা পড়েছে, না নিজেই বিদ্রোহীদের সাথে গিয়ে মিলেছে, কে জানে!'
'এমন সন্দেহ তো কোনদিন হয়নি!' আলী বিন সুফিয়ান বললেন, 'ঠিক আছে, আমি তার খোঁজখবর নিচ্ছি।'
ওখান থেকে বেরিয়ে আলী বিন সুফিয়ান নিজেই আলকিন্দির বাড়ীতে চলে গেলেন। তার বারোজন বডিগার্ডের সবাই মহলেই ছিল। আলী তাদের কমাণ্ডারকে জিজ্ঞেস করলেন,

‘সেনাপতি আলকিন্দি কোথায়?’
সে কোন সন্তোষজনক জবাব দিতে পারল না। বডিগার্ডদের জিজ্ঞেস করা হলো, তারাও না জানার ভান করলো। কেউ বলতে পারলো না তিনি কোথায়?
মহলে একজন অতি বৃদ্ধা চাকরানী ছিল, তাকে ডেকে বলা হলো, আলকিন্দির বিবিদেরকে জিজ্ঞেস করে জেনে এসো, আলকিন্দি কোথায় আছে?
বৃদ্ধা চাকরানী তাকে ভেতরে ডেকে নিয়ে নির্জন এক কামরায় বসিয়ে বললো, ‘এ মহল থেকে তার কোন সংবাদ পাবেন না। কেউ বলবে না, তিনি কোথায় আছেন। আমি দীর্ঘদিন ধরে এখানে আছি, এখানে যেসব কার্যকলাপ চলছে, যা আমি নিজের চোখে দেখেছি, সে সব কথাও আমি আপনাকে বলতে পারছি না।’
আলী বিন সুফিয়ান বৃদ্ধার কথায় রহস্যের গন্ধ পেলেন। অবাক হলেন তিনি। বুঝতে পারলেন, এমন কিছু হচ্ছে এখানে, যার খবর তিনি জানেন না। তিনি বললেন, ‘কিন্তু তোমাকে সব কথাই খুলে বলতে হবে?’
‘তাহলে আমার জানের নিরাপত্তা থাকবে না।’
‘যদি আমি তোমার নিরাপত্তার জিম্মা নিয়ে নিই?’
‘তাহলে আমি এমন সব কথা আপনাকে বলতে পারবো, যা আপনার বিশ্বাস হবে না।’
‘কিন্তু তার আগে তুমি বলো, কেন তুমি আমাকে এসব কথা বলতে চাও? তুমি নিজে থেকে আমাকে সতর্ক না করলে

আমি তো তোমাকে কিছুই জিজ্ঞেস করতাম না।'

'দেখুন, আমার স্বামী অনেক দিন হলো মারা গেছেন। একটাই মাত্র সন্তান ছিল, সেও সুদানের যুদ্ধে শহীদ হয়েছে। বাঁচার তাগিদে আমি এখানে চাকরানী হয়েছি।

এরা আমাকে নি:স্ব, গরীব ও অসহায় বলেই জানে। সহজ সরল অসহায় এক বৃদ্ধার সামনে কোন কথাই ওদের মুখে আটকায় না। কিন্তু ওরা এটা চিন্তা করে না, আমি একজন শহীদের মা। এই দেশ, জাতি ও ধর্মের প্রতি আমার স্বামী-সন্তানই কেবল দায়বদ্ধ ছিল না, এক বিশ্বস্ত স্ত্রী ও স্নেহশীল মা হিসাবে আমারও কিছুটা দায়িত্ব আছে। যে দেশ ও ধর্মকে ভালবেসে প্রাণ দিয়েছে ওরা, তার প্রতি আমারও রয়েছে গভীর ভালবাসা ও দায়িত্বের বোধ। দেশ, জাতি ও ধর্মের বিরুদ্ধে আমি কোন ষড়যন্ত্র ও কথা সহ্য করবো, এটা ওরা কল্পনা করে কিভাবে?

আমার একমাত্র কলিজার টুকরা যে আদর্শের জন্য শহীদ হয়েছে, সে আদর্শের বিরুদ্ধে এ মহলে চলছে গভীর ষড়যন্ত্র। এখানে প্রায়ই সন্দেহজনক লোকজন আসা-যাওয়া করে। আমি এক রাতে একজন লোককে ছদ্মবেশে ভেতরে আসতে দেখলাম। আরবী পোশাক ও নকল দাড়ি নিয়ে লোকটি মহলে প্রবেশ করেছিল। আমাকে ভেতরে ডেকে বললো, 'শরাব নিয়ে এসো।'

অতিথিরা এলেই মালিকের এক নতুন বেগম শরাব পরিবেশন করে তাদের। এ বেগম মিশরী কি সুদানী বোঝা যায় না।

আমি দেখলাম, দাড়িওয়ালা মেহমান দাড়ি খুলে রেখে মালিকের সাথে মদ পান শুরু করলো। এর আগেও এখানে এ ধরনের লোক আসতে দেখেছি, যাদের দেখলেই সন্দেহজনক মনে হয়। আমার কানে এমন কথাও এসেছে, 'অর্ধেক মিশর সুদানের আর অর্ধেক মিশর থাকবে তোমার।' মালিক তাদের আশ্বাস দিয়ে বলেছে, 'সময় হলে এক রাতের মধ্যেই কাজ সমাধা করে ফেলবো।'

'এটা কবেকার কথা?'

'সেনাপতি যে রাতে বের হয়েছেন সে রাতের। তখন তার সাথে ছিল দুই আগন্তুক। বেরোনোর সময় আমি রক্ষী কমাণ্ডারের সাথে সেনাপতিকে কানে কানে কথা বলতে দেখেছি।'

আলী বিন সুফিয়ানের প্রশ্নের জবাবে এমন আরও কিছু তথ্য প্রমাণ উপস্থাপন করলো বৃদ্ধা, আলী বিশ্বাস করতে বাধ্য হলেন, সেনাপতি আলকিন্দিকে কেউ অপহরণ করেনি, হত্যাও করেনি। আর সে কোন সরকারী কাজেও বাইরে যায়নি, বরং নিজেই এক গভীর ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে।

মিশরে দুষ্কৃতকারী ও গাদ্দারদের সংখ্যা এত বেশী ছিল যে, গুটিকয় বিশ্বস্ত লোক ছাড়া কোন ভদ্র পরিবারকেও সন্দেহ না করে উপায় ছিল না। আলকিন্দি সেই বিশ্বস্ত লোকদের একজন হওয়ায় এতদিন তিনি এদিকে নজর দেননি। কিন্তু আলী বিন সুফিয়ানের ভাগ্যটাই এমন, কেমন করে যেন

ষড়যন্ত্রের গন্ধ পেয়ে যান তিনি। যেখানেই ষড়যন্ত্র সেখানেই তিনি সময় মত পৌঁছে যান। তারপর তথ্য অনুসন্ধান করে মাথার চুল আর গায়ের পশম আলাদা করে ফেলেন।

কিন্তু একজন জেনারেলের বাড়ীতে স্বাক্ষী প্রমাণ ছাড়া তল্লাশী চালানো সম্ভব ছিল না। সে জন্য মিশরের পদে অধিষ্ঠিত সুপ্রিম কমাণ্ড তকিউদ্দীনের অনুমতির প্রয়োজন। তিনি দ্রুত স্পেশাল ব্রাঞ্চের কয়েকজন গোয়েন্দাকে ডেকে আলকিন্দির মহলের আশেপাশে কড়া দৃষ্টি রাখার জন্য গোপনে ওঁৎ পাতার ব্যবস্থা করলেন। তাদেরকে নির্দেশ দিলেন, 'পুরুষ হোক, নারী হোক, মহলের বাইরে কেউ এলে গোপনে তার অনুসরণ করবে।'

এরপর তিনি আলকিন্দির বডিগার্ড কমাণ্ডারকে আদেশ দিলেন, 'নিজের ও সমস্ত রক্ষীদের অস্ত্রশস্ত্র জমা দাও। আর সবাই আমার সঙ্গে চলো।'

বারোজন রক্ষীকে নিরস্ত্র করে আলী বিন সুফিয়ান তার সঙ্গে নিয়ে গেলেন। ওদের কারারুদ্ধ করে ছুটে গেলেন দেশের সর্বাধিনায়ক তকিউদ্দীনের কাছে। খুলে বললেন সব কথা।

তকিউদ্দীন দ্রুত এবং অতর্কিতে আলকিন্দির মহলে তল্লাশী চালাতে আদেশ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যদের একটি ক্ষুদ্র দলকে ডাকা হলো তল্লাশী অভিযান চালানোর জন্য।

এদিকে আলকিন্দির মহলে ঘটে গেল এক ভীষণ কাণ্ড। আলী বিন সুফিয়ান মহল থেকে বেরিয়ে যেতেই আলকিন্দির নতুন

বিবি বৃদ্ধা চাকরানীকে তার কামরায় ডেকে নিয়ে গেল। তাকে জিজ্ঞেস করলো, 'আলী বিন সুফিয়ান তোমাকে কি প্রশ্ন করেছেন? আমাকে খুলে বলো, তুমি সে প্রশ্নের কি উত্তর দিয়েছো?'

বৃদ্ধা চাকরানী উত্তরে বললো, 'তিনি সেনাপতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন, তিনি কোথায়? আমি তাকে বলেছি, আমি গরীব চাকরানী, তিনি কোথায় গেছেন আমি তার কিছুই জানি না।'

'তুমি সবই জানো, তোমার অজানা কিছু নেই।' নতুন বেগম বললো, 'আর তুমি তাঁকে অনেক কিছু বলেছো, কারণ অনেক সময় ধরে কথা বলেছো তোমরা। এটুকু কথা বলতে এত সময় লাগার কথা নয়। সত্যি করে বলো, তুমি তাকে কি বলেছো?'

বৃদ্ধা তার দাবীতে অটল থাকলো, কিছুতেই মুখ খুললো না। বেগম এক চাকরকে ডেকে সব কথা তাকে খুলে বললো। তারপর আদেশ দিল, 'এই অবাঞ্ছিত বৃদ্ধার মুখ থেকে আসল কথা বের করো। আমি নিশ্চিত, সে আলীকে এমন কিছু বলেছে, যা এখন স্বীকার করছে না।'

চাকর বৃদ্ধার মাথার চুল ধরে টান মেরে তাকে নিচে ফেলে দিল। তারপর বৃদ্ধার গলার ওপর পা চেপে ধরে বললো, 'বল বুড়ি, তুই তাকে কি বলেছিস?'

বুড়ির দম বন্ধ হয়ে গেল। চোখ ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইলো বাইরে। চাকর গলার ওপর থেকে পা উঠায়ে নিল।

বুড়ির তখন উঠে বসার ক্ষমতা আর ছিল না। সে তার অসাড় দেহটি মেঝেতে রেখে তেমনি পড়ে রইলো। চাকর তার কোমরে সজোরে লাথি মারলো। বুড়ি মরার মত গোঁঙাতে লাগলো। তবুও মুখ না খোলায় চাকর তাকে মারতে লাগলো। মার খেয়ে বুড়ি আধমরা হয়ে গেল।

নতুন বেগম বললো, 'ওকে একদম জানে মেরে ফেলো।'

এ কথা শুনে বুড়ি হাঁফাতে হাঁফাতে বললো, 'আমি আমার শহীদ সন্তানের আত্মার সাথে গাদ্দারী করতে পারি না। তোমরা গাদ্দার! তোমরা বেঈমান! তুমি এক বদকার মেয়ে মানুষ!'

'একে এখান থেকে সরিয়ে নাও! গোপন কামরায় নিয়ে ওকে শেষ করে দাও।' বেগম বললো, 'রাতে এর লাশ গায়েব করে দেবে। আমাদের সামনে এখন ভয়ানক বিপদ। আলী আমাদের রক্ষীদের নিরস্ত্র করে সঙ্গে নিয়ে গেছে। আমাদের অনেক গোপন কাজের সাক্ষী এই হতভাগী বুড়ি। তাই ওর বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই। এখনি তাকে হত্যা করে সব গোপন রহস্য মাটির নিচে গোপন করে দাও।'

বুড়ি মেঝের ওপর বেহুশের মত পড়েছিল। যদিও সে পুরোপুরি বেহুশ হয়নি, তখনও তার জ্ঞান ও বুঝার শক্তি কিছুটা হলেও অবশিষ্ট ছিল।

চাকর তাকে কাঁধে উঠিয়ে গোপন কক্ষে নিয়ে যাচ্ছিল! কামরা থেকে বের হয়ে উঠোনে পা দিতেই সহসা আওয়াজ হলো, 'এই থাম! এক পাও নড়বি না।'

সে চেয়ে দেখলো, সৈন্যরা ছুটে আসছে। সে বোকার মত বুড়িকে কাঁধে নিয়েই ওখানে দাঁড়িয়ে রইলো।

আলী বিন সুফিয়ানের আদেশে সৈন্যরা কেউ মহলের মধ্যে, কেউ মহলের বাইরে ছড়িয়ে পড়েছে। চাকর পালানোর পথ পেল না।

সৈন্যরা এগিয়ে তার কাঁধ থেকে বুড়িকে নামালো। বুড়ির মুখ থেকে তখনও রক্ত ঝরছিল। সে চোখ খুলে আলী বিন সুফিয়ানকে সামনে দেখতে পেলো।

তার মুখে ফুটে উঠলো হাসি। বললো, 'আল্লাহর শোকর তুমি এসে পড়েছো। এরা যে এতটা ভয়ংকর বুঝতে পারিনি, নইলে আগেই তোমাকে খবর দিতাম।'

'তোমার এ অবস্থা হলো কি করে?' বিস্মিত আলী প্রশ্ন করলেন।

তার শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিলো। অনেক কষ্টে কোন রকমে বললো, 'নতুন বেগম ও তার চাকর আপনার সাথে আমার কি কথা হয়েছে তা বের করার জন্য আমাকে মেরে এই অবস্থা করেছে।'

আলী বিন সুফিয়ান একজন সৈন্যকে বললো, 'বুড়িমাকে জলদি ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও।'

বুড়ি বাঁধা দিয়ে বললো, 'আমাকে আর কোথাও পাঠাবেন না, আমি আমার শহীদ বেটার সান্নিধ্যে চলেছি।'

তার জবান বন্ধ হয়ে গেল। এর একটু পরই বৃদ্ধা চির নিদ্রায় ঘুমিয়ে গেল।

আলকিন্দির মহলের প্রতিটি কামরায় তন্ন তন্ন করে তল্লাশী চালানো হলো। গোপন কামরায় পাওয়া গেল অস্ত্রের ভাণ্ডার। প্রচুর সোনার ইট ও কাড়ি কাড়ি নগদ টাকা পয়সা পাওয়া গেল মহলের মধ্যে রক্ষিত সিন্দুকে।

আরো পাওয়া গেল অনেক নতুন মুদ্রা, যার ওপর মিশরের সুলতান হিসাবে আলকিন্দির নাম খোদাই করা ছিল।

আলকিন্দি বিজয়ের ব্যাপারে এতটা নিশ্চিত ছিল যে, সে তার নামে মুদ্রা পর্যন্ত তৈরী করে ফেলেছিল। এই মুদ্রাই তার অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে সত্য প্রমাণ করলো।

আলকিন্দির মহলে পাওয়া গেল ছয়জন রূপসী নারী, তারা সবাই নিজেদেরকে আলকিন্দির বেগম বলে পরিচয় দিল।

পাওয়া গেল কাড়ি কাড়ি মদের বোতল। মনে হচ্ছিল মদের একটা আস্ত ডিপো এখানে।

আলকিন্দি সম্পর্কে সবার ধারণা ছিল, তিনি শরাব পান করেন না। কিন্তু এখন তার মহলে শরাবের ছড়াছড়ি দেখে প্রমাণ হলো, তিনি রাতে মদ পান করতেন।

আলী বিন সুফিয়ান তার বিবিদের আলাদা আলাদা জবানবন্দী নিলেন। তাদের কথা থেকে অনেক নতুন ও প্রয়োজনীয় তথ্য বেরিয়ে এলো।

সব শেষে জবানবন্দী দেয়ার পালা ছোট বেগমের। এই বেগমই তার চাকর দিয়ে বুড়িকে হত্যা করেছে।

অন্যান্য বিবিরা সবাই এক বাক্যে বলেছে, সব ষড়যন্ত্রের

হোতা ছোট বেগম। সকল গোপন তথ্য একমাত্র সেই জানে। তার সম্পর্কে আরও বলেছে, তার ভাষা মিশরী নয়, সুদানী। বাইরের কোন মেহমান এলে, তাদের সঙ্গে উঠাবসা ও কথাবার্তা একমাত্র সেই বলতো। সে তাদের সাথে একত্রে বসে মদও পান করতো।

নতুন বেগমকে আগেই পৃথক করে রাখা হয়েছিল। বৃদ্ধাকে হত্যার আসামী চাকরকে আলী বিন সুফিয়ান সতর্ক করে বললেন, 'এখন কোন কিছু গোপন করতে চেষ্টা করো না।'

চাকর ভাল মতই জানতো, যদি সে কিছু না বলে তবে তার ওপর কেমন শাস্তি ও কিয়ামত শুরু হয়ে যাবে। সে কারণে সে তার অপরাধ লুকানোর চেষ্টা করলো না। বললো, 'আমি শুধু হুকুমের দাস। আমাকে পুরস্কারের লোভ দেখানো হলে আমি তা সামলাতে পারিনি।'

আলী বিন সুফিয়ানকে সে আরো জানালো, 'সুদানীদের সাথে আলকিন্দির যোগাযোগ অনেক দিন থেকে। সেদিনও তিনি তাদের সাথেই গেছেন। যাওয়ার সময় সাহেব বলে গেছেন, তিনি অনেক দিন পরে আসবেন। আর বলেছেন, তার এ অনুপস্থিতির কথা যতদূর সম্ভব গোপন রাখতে। কিন্তু সাহেব কোথায় গেছেন আমি জানি না।'

নতুন বেগমকে আলী বিন সুফিয়ান তাঁর দুই কমাণ্ডোর সাথে নির্যাতন সেলে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এখানকার অনুসন্ধান শেষ করে আলকিন্দির মহলে কড়া প্রহরা বসিয়ে তিনি ফিরে এলেন তার কার্যালয়ে। প্রথমে গেলেন আলকিন্দির নিরস্ত্র

বডিগার্ডদের কাছে। সবাইকে একত্রিত করে বললেন, 'তোমরা মিশরের সেনাবাহিনীর সদস্য। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষা করা তোমাদের দায়িত্ব। আলকিন্দি তোমাদের দায়িত্বশীল ছিলেন। তার হুকুম পালন করতে তোমরা বাধ্য ছিলে। সুতরাং তার নির্দেশে তোমরা যা করেছো সে জন্য তোমরা দায়ী নও। কিন্তু এখন আমি যে সব প্রশ্ন করবো তার কোন ভুল জবাব দিলে বা কোন তথ্য গোপন করলে সে অপরাধের কোন ক্ষমা পাবে না। আর এ অপরাধের একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।'

প্রথমেই তিনি বডিগার্ডদের কমাণ্ডারকে সামনে ডাকলেন। বললেন, 'আলকিন্দির ষড়যন্ত্র সম্পর্কে যা জানো, সব খুলে বলো।'

কমাণ্ডার যা বললো তাতে আলকিন্দির ষড়যন্ত্র পরিষ্কার হয়ে গেল। সে স্বীকার করলো, আলকিন্দির কাছে খৃস্টান ও সুদানীরা আসা-যাওয়া করতো। আলকিন্দি যে গাদ্দারীর পথ অবলম্বন করেছে, তাও তারা বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু আলকিন্দি এখন কোথায় গেছে তা তার জানা নেই।

মধ্য রাতে আলী বিন সুফিয়ান সেই গোপন কক্ষে গেলেন, যেখানে আলকিন্দির নতুন বেগম সংকীর্ণ এক কুঠরীতে বন্দী ছিল। তাকে আতংকগ্রস্থ করার জন্য সে কুঠরীতে এমন এক কয়েদী এনে রেখেছিল, যে অনবরত কষ্টে ছটফট করছে, মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে।

এ কয়েদী খৃস্টানদের গোয়েন্দা ছিল। সে তার সঙ্গীদের নাম ঠিকানা দেয়নি বলে নির্যাতনের শিকার হয়েছে। নতুন বেগম রাত দ্বিপ্রহর পর্যন্ত তার সাথেই কাটিয়েছে। তার মৃত্যু যন্ত্রণার ছটফটানি দেখেছে।

মধ্য রাতও পার হয়ে গেল। নতুন বেগম শান শওকত ও প্রাচুর্যে মানুষ হয়েছে, এই গোপন সংকীর্ণ কুঠরীতে দুর্গন্ধ ও বিভৎস দৃশ্যে তার প্রায় পাগলিনী হবার উপক্রম। কয়েদীর শাস্তি দেখে তার রক্ত শুকিয়ে গিয়েছিল। আলী বিন সুফিয়ান তার সামনে উপস্থিত হলেন।

তাকে দেখেই ভয়ে হাউমাউ করে কান্না জুড়ে দিল ছোট বেগম। আলী তাকে সেখান থেকে সরিয়ে অন্য এক কামরায় নিয়ে এল। আগের চাইতেও দেখতে ভয়াবহ এ কুঠরী। সামনে লোহার মোটা গরাদ। ভেতরে এক কালো কুৎসিত নিগ্রো হাবশী বন্দী। তার চেহারা ভয়ংকর মহিষের মত। সে সীমান্তে এক কমাণ্ডারকে হত্যা করেছিল। আলী বিন সুফিয়ান তাকে বললো, 'অবশিষ্ট অর্ধেক রাত এর সঙ্গেই কাটাতে হবে তোমাকে।'

বেগম চিৎকার দিয়ে আলী বিন সুফিয়ানের পায়ের ওপর আছড়ে পড়লো।

'তুমি আমাকে কি প্রশ্ন করবে বলো, আমি সব বলে দিচ্ছি।' বেগম আলী বিন সুফিয়ানের পা আঁকড়ে ধরে বললো।

'তোমার স্বামী আলকিন্দি কোথায় গেছে, কেন গেছে, কি তার উদ্দেশ্য, সব খুলে বলবে? আর যা বলবে সব সত্যি বলবে?'

আলী বিন সুফিয়ান প্রশ্ন করলেন।

সে হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বললো, 'বলবো, বলবো। আমি যা জানি সব বলবো!'

এরপর সে ভয়ে গড়গড় করে অনেক কথাই বললো, কিন্তু আলকিন্দি কোথায় গেছে তা সেও বলতে পারলো না। তবে সে এমন কিছু তথ্য দিল, যা সত্যি গুরুত্বপূর্ণ। সে বললো, 'সুদান থেকে বহু হাবশী সৈন্য মিশরে ঢুকানো হয়ে গেছে। এখন যে কোন মুহূর্তে রাতের আঁধারে ওরা অতর্কিতে কায়রো আক্রমণ করে মিশর দখল করার স্বপ্ন দেখছে। সম্ভবত চূড়ান্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন করতেই এবার তিনি বাইরে গেছেন।'

আলকিন্দির বাসায় খৃস্টান ও সুদানীদের নিয়ে যতো গোপন বৈঠক হতো সে সব বৈঠকে খাদ্য ও পানীয় পরিবেশনের দায়িত্ব ছিল তার। স্বদেশী হিসাবে তাদের সাথে ছিল তার গভীর সখ্যতা। সে মেহমানদের সাথে নিসংকোচে মিশতো, তাদের সাথে কথা বলতো আর আলকিন্দিও গোপন শলাপরামর্শের সময় তাকে সরিয়ে দেয়ার প্রয়োজন বোধ করতো না।

এ মেয়ে ছিল সুদানের এক ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত ঘরের সন্তান। সুদানীরা তাকে আলকিন্দির কাছে উপহার স্বরূপ পাঠিয়েছিল। পরে আলকিন্দি তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

মেয়েটি ছিল বেশ চালাক চতুর ও হুশিয়ার। সে সুদানের উদ্দেশ্য খুব ভালমতই জানতো। একজন সুদানী হিসাবে সুদানীদের স্বার্থ রক্ষা করাকে সে নিজের দায়িত্ব মনে

করতো।
সে আরো প্রচুর নগদ সোনাদানা ও ধণ রত্নের সন্ধান দেয়। এসব ধন সম্পদ সুদানীরা তাকে দিয়েছিল যুদ্ধের খরচ মিটানো ও গাদ্দারদের খরিদ করার জন্য। এ মেয়ে জানতো, হাবশী সৈন্যরা কোথায় লুকিয়ে আছে।
সে আলী বিন সুফিয়ানকে বললো, 'হাবশী সৈন্যরা নীলনদ পাড়ি দিয়ে আপনাদের সীমান্ত চৌকির পাহারাদারদের চোখে ধুলো দিয়ে 'সামেন' পাহাড় শ্রেণীর আড়ালে লুকিয়ে আছে।'
আলী বিন সুফিয়ান তকিউদ্দীনকে বিস্তারিত রিপোর্ট দান করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।
তিনি সৈন্যদের দু'জন, চারজন করে ছোট ছোট দলে ভাগ করে শত্রুর তৎপরতা লক্ষ্য করার জন্য তাদেরকে চারদিকে ছড়িয়ে দিলেন। সীমান্ত থেকে কায়রো পৌঁছার রাস্তায় রাস্তায় ছড়িয়ে পড়লো তারা।
তিনি সৈন্যদের বললেন, 'এরই মধ্যে সুদানীরা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে পথচারীর বেশে হয়তো অনেকেই কায়রো বা তার আশপাশে এসে অবস্থান নিয়েছে। সুদানী সৈন্যদের এসব আড্ডা কোথায় তা খুঁজে বের করো।'
আলী বিন সুফিয়ান এ খবর সুলতান আইয়ুবীকে জানানোর কথা চিন্তা করছিলেন, কিন্তু তকিউদ্দীন বললেন, 'তার কোন দরকার নেই। কারণ এতে তিনি শুধু পেরেশান হবেন, বাস্তবে কোন উপকার করতে পারবেন না।'
এ কথায় আলী স্বস্তি পেলেন না, তার আশঙ্কা হলো, অবস্থা

বেশ জটিল ও খারাপ হয়ে যেতে পারে। তিনি তকিউদ্দীনকে পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝানোর চেষ্টা করলেন। আলীর উপর্যুপরি চাপে শেষ পর্যন্ত তকিউদ্দীন রাজি হলেন। বললেন, 'ঠিক আছে, এত করে যখন বলছেন তখন কাউকে পাঠিয়ে দিন।'

অনুমতি পাওয়ার সাথে সাথেই আলী সামগ্রিক অবস্থার পূর্ণ বিবরণ লিখে এক উর্ধতন সামরিক অফিসারকে চারজন বডিগার্ডসহ জরুরী ভিত্তিতে পাঠিয়ে দিলেন। তাদেরকে বলে দিলেন, 'দ্রুত সুলতানের কাছে পৌঁছার চেষ্টা করবে। প্রয়োজনে প্রত্যেক ফাঁড়ি থেকে ঘোড়া বদল করে নেবে। যতটা সম্ভব কম বিশ্রাম নিয়ে বিরতিহীন ভাবে পথ চলবে।'

যুদ্ধের সময় সুলতান আইয়ুবীর হেড কোয়ার্টার কোন এক জায়গায় নির্দিষ্ট থাকে না। ক্রমাগত জায়গা বদল করেন তিনি। দেখা গেল দিনে এক জায়গায়, রাতে অন্য জায়গায় তার ক্যাম্প সরিয়ে নিয়েছেন। ফলে শত্রুরা সহজে তার নাগাল পেতো না। কিন্তু নিজের বাহিনীর সাথে যোগাযোগ রাখার জন্য তিনি এমন ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন, মুহূর্তে ময়দানের সব খবর পৌঁছে যেতো তার কাছে। আবার তিনি কোন সংবাদ পৌঁছাতে চাইলে সঙ্গে সঙ্গেই তা পৌঁছে দিতে পারতেন যে কোন জায়গায়। এই ব্যবস্থার ফলে সুলতানের কাছে পৌঁছতে বার্তা বাহকদের কোনই অসুবিধা হতো না।

কায়রো থেকে রওনা দেয়ার তিন দিন পর।

সুলতানের জন্য আলীর দেয়া চিঠি নিয়ে সেনা কমাণ্ডার দামেশকে পৌছলেন। সুলতান আইয়ুবী তখন আর রিস্তানের

পর্বতশৃঙ্গে সম্রাট রিমাণ্ডের ফিরতি বাহিনীর জন্য অপেক্ষা করছেন।

ঠাণ্ডা একটু বেশীই পড়েছে আজ। তুষারপাত হচ্ছে, বরফ জমেছে পাহাড়ে। সুলতান ও তাঁর সৈন্যরা এরই মাঝে ওঁৎ পেতে বসে আছেন।

কায়রো থেকে দামেশক পৌঁছার পথে সেনা অফিসার ও তার রক্ষীরা বলতে গেলে কোথাও তেমন বিশ্রাম নেয়নি। শীতের ঠাণ্ডা ছোট্ট দিন ও দীর্ঘ হিমেল রাতের অধিকাংশ সময় তাদের কেটেছে পথে, ঘোড়ার পিঠে চড়ে।

দামেশকে যখন পৌঁছলো তখন তাদের জিহবা বেরিয়ে এসেছে, মাথা ঘুরছে, ঘোড়া থেকে পড়ে যায় এমন অবস্থা।

তারা দ্রুত আইয়ুবীর কাছে পৌঁছতে চাচ্ছিল। দামেশকের কমাণ্ডার তাদেরকে জোর করে ধরে পানাহার করিয়ে 'আর রিস্তানের' পথ দেখিয়ে দিল।

আল মালেকুস সালেহকে সাহায্য করতে আসা ত্রিপলীর খৃস্টান রাজা রিমাণ্ড-এর ফিরতি পথে সুলতান আইয়ুবী ওঁৎ পেতে বসে থাকায় তিনি অন্যপথে সেখান থেকে বেরিয়ে দেশে ফিরে গেলেন। সুলতান খবর পেয়েও রিমাণ্ডকে ধাওয়া করলেন না।

তিনি রিমাণ্ডের জন্য রসদপত্র নিয়ে আসা কাফেলার পথ রুদ্ধ করে দিয়েছিলেন। রিমাণ্ড যে ফিরে গেছে এ খবর তারা জানতো না। তারা অপেক্ষা করছিল, রিমাণ্ড এসে সুলতানের

বাঁধা অপসারণ করে তাদের অগ্রযাত্রার পথ নিষ্কণ্টক করবে। কিন্তু কয়েকদিন অতিবাহিত হওয়ার পরও রিমাণ্ডের বাহিনীর কোন তৎপরতা দেখতে না পেয়ে তারা ফিরে যাওয়ার কথা চিন্তা করেছিল। সুলতান আইয়ুবী রিমাণ্ডের ফিরতি পথে ধাওয়া না করে তার রসদপত্র ও মালসামান দখল বা ধ্বংস করার জন্য একদল কমাণ্ডোকে পাঠালেন।

শীতকালের বিচ্ছিরি বৃষ্টি হচ্ছিল। খৃস্টানদের রসদ সম্ভারের কাফেলা ছিল বিশাল। রাতের বেলা। কাফেলার লোকজন ও প্রহরীরা ঠাণ্ডা বাতাস ও বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য রসদ বোঝাই ঘোড়াগাড়ীর নিচে গিয়ে আশ্রয় নিল। কমাণ্ডার বললো, 'রাতটা কাটুক, কাল ভোরেই আমরা ফিরতি পথ ধরবো।'

প্রহরী ও লোকজন ঘোড়াগাড়ির নিচে ঘুমিয়েছিল। তারা জানতো না, দিন রাত চব্বিশ ঘন্টাই পাহাড়ের আড়াল থেকে কতকগুলো চোখ তাদের গতিবিধির ওপর লক্ষ্য রাখছে। রাতের আঁধারে এই কনকনে ঠাণ্ডা, শীত ও বৃষ্টির মধ্যে কেউ তাদের উপর আক্রমণ করবে, এমনটি তারা আশা করেনি।

মধ্য রাতের একটু পর। সহসা তাদের রসদ ক্যাম্পে খুব শোরগোল শোনা গেল। দেখা গেল, চারদিকে মশালের আলো। তাবু জ্বলছে।

সুলতান আইয়ুবীর কমাণ্ডো বাহিনী রাতের আঁধারে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ওদের ওপর। প্রথমে তারা ছোট মেনজানিক দিয়ে পেট্রোল ভেজা সলতে লাগানো অগ্নিগোলা নিক্ষেপ করলো।

সেই শিখার আলোতে তারা শুরু করলো তীর নিক্ষেপ।
পাহাড়ের কোলে একদল দাঁড়িয়ে রইলো বর্শা ও তলোয়ার নিয়ে। তাবুতে আগুন লাগায় এবং রাতের অন্ধকারে অতর্কিত আক্রমণে পড়ে ভয়ে বহু খৃস্টান প্রহরী ও লোকজন ছুটলো পাহাড়ের আড়ালে গিয়ে লুকানোর জন্য। পাহাড়ের কোলে দাঁড়িয়ে থাকা আইয়ুবীর কমাণ্ডো বাহিনী বর্শা ও তলোয়ার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো ওদের ওপর। এ আক্রমণে বহু প্রহরী হতাহত হলো। বাকীরা প্রাণ নিয়ে ফিরে গেল ময়দানে।
পাহাড় থেকে তীর বর্ষণের ধারা অব্যাহত রইল। ময়দানে ফিরে গিয়েও তাই নিস্তার পেল না ওরা। বাধ্য হয়ে মালসামান ও গাড়ি ঘোড়ার আড়াল নিয়ে কেউ কেউ পাল্টা তীর নিক্ষেপ করতে থাকলো।
রাতভর চললো এ লড়াই। সকালে দেখা গেল, দেড় দুই মাইলের মধ্যে ছড়ানো ক্যাম্পে পোড়া তাবু, আধপোড়া রসদপত্র, বহু লাশ ও আহত লোক পড়ে আছে। লড়াই করার মত কেউ আর নেই সেখানে।
এ যুদ্ধে অগ্নি গোলার কবল থেকে বেঁচে যাওয়া বিপুল পরিমান রসদ, ঘোড়া ও ঘোড়াগাড়ী সুলতান আইয়ুবীর সৈন্যদের হস্তগত হলো।
হলবের অবরোধ উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল। সুলতান সেই গুরুত্বপূর্ণ শহরকে আরেকবার অবরোধ করার পরিকল্পনা করলেন।
পরদিন ভোরে কমাণ্ডো গ্রুপের কমাণ্ডার সুলতান আইয়ুবীকে

যখন গত রাতের আক্রমণের রিপোর্ট দিচ্ছিল তখন তাবুতে প্রবেশ করলো এক প্রহরী। সালাম দিয়ে সুলতানকে বললো, 'কায়রো থেকে একজন ফৌজি অফিসার এসেছেন। গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ নিয়ে এসেছেন তিনি। অবিলম্বে আপনার সাথে সাক্ষাত করার অনুমতি চাচ্ছেন।'

'কি নাম তার?'

প্রহরী অফিসারের নাম বলতেই সুলতান আইয়ুবী দ্রুত উঠে দাঁড়ালেন এবং ত্রস্ত পায়ে বাইরে যেতে যেতে বললেন, 'কই সে?'

খীমার বাইরে দাঁড়িয়েছিল অফিসার। সুলতানকে দেখেই সে সালাম দিল। সুলতান বললেন, 'কি খবর আরমান? তুমি কি সংবাদ নিয়ে এসেছো! সবকিছু ভাল তো?'

'খবর খুবই গুরুত্বপূর্ণ।' কমাণ্ডার বললো, 'আল্লাহ্ পাক আমাদের হেফাজত করুন। আলী বিন সুফিয়ান এই চিঠি দিয়েছেন আপনার জন্য।'

সুলতান দ্রুত হাত বাড়িয়ে চিঠি নিলেন এবং কমাণ্ডারকে নিয়ে ভিতরে গেলেন। চিঠি পড়া শেষ করে সুলতান গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে গেলেন।

'এখনও জানা যায়নি, সুদানী সৈন্যরা মিশরের কোথায় আত্মগোপন করে আছে?' সুলতান আইয়ুবী জিজ্ঞেস করলেন।

'তদন্ত ও অনুসন্ধানের জন্য চারদিকে সৈন্য পাঠানো হয়েছে। সীমান্তবর্তী পাহাড়ী অঞ্চলেও সৈন্য প্রেরণ করা হয়েছে। আলকিন্দির বেগমের ভাষ্যমতে নীলনদ পার হয়ে হাবশী

সৈন্যরা দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চলেই তাদের ঘাঁটি বানিয়েছে বলে মনে হয়।' কমাণ্ডার উত্তর দিল।

'আমার আশংকা ছিল, আমার অনুপস্থিতিতে কোন না কোন একটা বিশৃংখলা ঘটবেই।' সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'তকিউদ্দীনকে বলবে, সে যেন ভীত না হয়। কায়রোর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যেন আরও শক্তিশালী করে।'

সামান্য বিরতি নিয়ে তিনি আবার বললেন, 'শুধু প্রতিরক্ষামূলক প্রস্তুতিই এর জন্য যথেষ্ট নয়। তাকে বলবে, সুদক্ষ একদল সৈন্যবাহিনী নিজের কাছে রেখে বাকী সেনা সদস্যদের যেন পাল্টা আক্রমণ করার জন্য পৃথক করে ফেলে। তারা শহরেই থাকবে এবং আক্রান্ত হলে প্রতিরোধ ও প্রতি আক্রমণ করবে। এরা যেন বেশী নড়া চড়া না করে এবং শহরের মধ্যে যুদ্ধের প্রস্তুতি জাহির না করে। যেন শত্রুরা মনে করে আমাদের ফৌজ অপ্রস্তুত এবং তারা আক্রমণ করলে সহজেই শহর দখল করতে পারবে।

শহরের বাইরের সেনা ছাউনিতে সৈন্যরা প্রস্তুত থাকবে। শত্রুদের দেখতে পেলেই আক্রমণ করবে তাদের। কিছুতেই ওদের শহর অবরোধ করার সুযোগ দেবে না। অবরোধ করার আগেই পাল্টা আক্রমণ করে বিতাড়িত করবে।

সবচেয়ে ভাল হয় শত্রুদের আড্ডা খুঁজে পেলে। যদি শত্রুদের আড্ডার সন্ধান পাও তবে অল্প সৈন্য নিয়ে কমাণ্ডো আক্রমণের মাধ্যমে ওদের ধ্বংস করে দেবে।

সীমান্তে সৈন্য সংখ্যা বাড়াতে বলবে, যাতে শত্রু সৈন্য

পালাতে ও প্রবেশ করতে না পারে। আমি ভেবে পাচ্ছি না, এত সৈন্য সীমান্তে সশস্ত্র প্রহরায় থাকতে কেমন করে সুদানী সৈন্য মিশরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলো। কোন না কোন সীমান্ত ফাঁড়িতে ত্রুটি ও অবহেলা আছে। নইলে এমন হওয়া সম্ভব নয়। আলীকে বলবে, সে যেন ওই ফাঁক খুঁজে বের করে। আল্লাহ্ তোমাদের সফলতা দান করুন।

আরেকটি কথা, শত্রু সৈন্যরা খাদ্য ও সাহায্য ছাড়া যুদ্ধ করতে পারবে না। সীমান্তকে কঠোরভাবে সিল করে রাখবে। ব্যাপকভাবে যুদ্ধ বেঁধে গেলে যুদ্ধ দীর্ঘায়িত করবে। তাতে শত্রুরা ক্ষুধায় মারা যাবে। খাদ্য এমন এক অস্ত্র, যার সাথে অন্য কোন অস্ত্রের তুলনাই হয় না।

অধিক সৈন্যের সাথে অধিক সৈন্য নিয়ে সামনাসামনি যুদ্ধ করা মোটেই উচিৎ হবে না।

আমার ধারনা ছিল না, আলকিন্দি আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। তবুও আমি আশ্চর্য হচ্ছি না, বিশ্বাসঘাতকতা ও বেঈমানী করতে কোন সময় লাগে না।

ক্ষমতা ও নেতৃত্বের লোভ এমন এক সাপ, যে সাপের ছোবল খেলে মুহূর্তে মানুষের ঈমান মারা যায়। ন্যায়-অন্যায় বোধ নিঃশেষ হয়ে সেখানে জন্ম নেয় প্রবল স্বার্থপরতা। এই লোভ বড় ভয়ংকর জিনিস। এই সাপ ততক্ষণ মানুষকে দংশন করতে পারে না, যতক্ষণ কোরআনের আলোকে আলোকিত থাকে কারো হৃদয়। যখন মানুষ কুরআনকে বন্ধ করে নিজের বুদ্ধি বিবেক অনুযায়ী চলতে চায় তখন এমনি হাজারো

ভ্রান্তির সাপ ছোবল হানে তার মগজে।

সবচে আফসোসের বিষয় কি জানো! কেউ একবার লোভের কবলে পড়ে বেঈমান হয়ে গেলে, কোরআনের খোলা পৃষ্ঠাও আর তাকে হেদায়াত দান করে না। সে তখন কোরআন হাতে নিয়েও ইসলামের অগ্রযাত্রার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যেতে পারে। এসব গাদ্দাররা কোরআন হাতে নিয়ে যখন মানুষকে প্রতারিত করে তখনও আল্লাহর ভয়ে, পরকালের ভয়ে তার হৃদয় কাঁপে না।

আলকিন্দির জন্য আমার বড় আফসোস হচ্ছে। ইসলামের ভবিষ্যত নিয়েও আমি খুবই পেরেশান। আমাদের ভাইয়েরা আজ সামান্য সুখ সুবিধার জন্য খৃস্টানদের কাছে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। সাধারণ মুসলমানদের এক বিরাট অংশের মধ্যে কোন চেতনাই নেই। তারা নামাজ পড়ে, রোজা করে অথচ এদিকে যে ইসলামের বারোটা বেজে যাচ্ছে সে খেয়ালই নেই তাদের। ইসলামের অস্তিত্ব রক্ষায় তাদেরও কিছু করণীয় থাকতে পারে, এ অনুভূতিটুকু যদি ওদের থাকতো তবে এমন অবস্থার সৃষ্টি হতো না।

অন্যদিকে আছে ইসলামের মুখোশধারীদের দল। তারা রাতভর গাছের গোড়া কাটে, দিনভর পানি ঢালে সে গাছের গোড়ায়। একদিকে ইসলামের বারোটা বাজানোর জন্য শত্রুর ক্রীড়নক হয়ে কাজ করে, অন্যদিকে ভাব দেখায় তারা ইসলামের খুব ভক্ত। লোক দেখানো হাজী হয়, মাজারে সিজদা দিয়ে পড়ে থাকে আর সমস্ত অনৈতিক ও অপকর্মের

নেতৃত্ব দিয়ে সমাজে সৃষ্টি করে ফেতনা ফাসাদ।

আজ আমাদেরকে লড়াই করতে হচ্ছে আমাদের ভাইদের বিরুদ্ধে। শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করা সহজ, কিন্তু এই ফেতনার বিরুদ্ধে লড়াই করা সত্যি খুব কঠিন। খৃস্টানদের বিরুদ্ধে ডাক দিলে সমাজের প্রতিটি সচেতন মানুষ সে ডাকে সাড়া দেবে, কিন্তু আলকিন্দির বিরুদ্ধে যখন লড়াই করবে তখন ডাক দিলে দেখবে, কিছু মুসলমানের সমর্থন সেও পাবে। কারণ, সে তো আর কাফের নয়! কিন্তু তার এ বিদ্রোহ যে ইসলামের ধ্বংস ও বিনাশ ডেকে আনছে সে কথা অনেকেই বুঝতে পারবে না।

আমাদের নেতা ও সরদার সুলতান নুরুদ্দিন জঙ্গী এ দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছেন। আমিও শিঘ্রই দুনিয়া থেকে বিদায় নেব। তারপর কি হবে? এ প্রশ্নই আমাকে অধীর করে তুলছে।

একটি কথা সব সময় স্মরণ রাখবে, যতক্ষণ বেঁচে থাকবো ইসলামের জন্যই বেঁচে থাকবো, আর মরতে হলেও ইসলামের জন্যই মরবো, এই আমাদের শপথ, এই আমাদের পণ। এ শপথের কথা কখনো বিস্মৃত হয়ো না। নিয়মিত সব সংবাদ আমাকে পৌছে দিও। আল্লাহ তোমাদের সহায় হোন।'

আলীর পাঠানো সামরিক অফিসার সুলতানের উপদেশ ও নির্দেশ নিয়ে বিদায় হলেন।

মিশরের সৈন্যরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। তারা হন্যে হয়ে খুঁজে ফিরছিল শত্রুদের আড্ডা।

তারা যখন কায়রোর আশেপাশে শত্রুদের খুঁজে ফিরছে, সে সময় তাদের সীমান্ত ফাঁড়ির কমাণ্ডার শত্রুদের হাতে বন্দী, তার সঙ্গে বন্দী জোহরা নামের এক মেয়ে।

কয়েকদিন ধরে কমাণ্ডার নিখোঁজ। সহকারী কমাণ্ডার চিন্তায় পড়ে গেল। পাশের ফাঁড়ি ও আশপাশে খোঁজ খবর করে কোনই হদিস পেল না। এভাবে কাউকে কিছু না বলে কমাণ্ডারের উধাও হয়ে যাওয়া কোন সাধারণ ঘটনা নয়। সহকারী কমাণ্ডার দ্রুত এক সিপাইকে এ খবর দিয়ে কায়রো পাঠিয়ে দিল।

কাসেদ কায়রো গিয়ে জানালো, 'আমাদের ফাঁড়ির কমাণ্ডার কয়েক দিন যাবৎ নিখোঁজ রয়েছেন।'

সে আরো জানালো, 'কিছুদিন আগে আমাদের ফাঁড়িতে নাচ গানের আসর বসেছিল। এক নর্তকী কমাণ্ডারের তাবুতে রাত কাটায়। তারপর পাশের ফাঁড়িতেও তারা নাচ গানের আসর বসায়। সেখানে মেহমান হিসাবে গিয়েছিল আমাদের কমাণ্ডার।

এরপরও দুই রাত সেই নর্তকী আমাদের কমাণ্ডারের ওখানে আসে। সেই নর্তকীর সাথে এক রাতে কমাণ্ডার বেরিয়ে যায়, কিন্তু আর ফিরে আসেনি। কয়েকদিন হয়ে গেলো, কমাণ্ডারের কোন খোঁজ না পেয়ে সহকারী কমাণ্ডার আমাকে এ খবর দিয়ে আপনাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে।'

এ সংবাদে সবার সন্দেহ হলো, নিশ্চয় কমাণ্ডার শত্রুদের সাথে হাত মিলিয়েছে আর তারই সাহায্যে শত্রুরা মিশরে প্রবেশ

করার সুযোগ পেয়েছে।

আলী বিন সুফিয়ান বললো, 'যেহেতু ফাঁড়িটি নদী পথ পাহারা দেয়ার জন্যই খোলা হয়েছে, এতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, শত্রুরা নদী পথে এসে জমা হয়েছে।'

সিদ্ধান্ত হলো, কোন এক দুরদর্শী ও চালাক কমাণ্ডারকে সেখানে পাঠানো হবে। তার সাথে যাবে একটি রক্ষী দল। ওরাই ওখানকার সীমান্ত পাহারার দায়িত্ব পালন করবে।

কমাণ্ডার ও জোহরাকে হাবশীদের ধর্মীয় নেতার হাতে তুলে দেয়া হয়েছিল। কার্যত তারা বন্দী থাকলেও ধর্মীয় নেতা তাদের সাথে খুবই সদয় ব্যবহার করছিল। হাবশীদের ব্যবহারে তারা যে বন্দী তা বুঝা যাচ্ছিল না।

তাদেরকে পাখীর রং-বেরংয়ের পালকে সাজানো পোশাক পরতে দেয়া হলো। ফুল ও পালক দিয়ে সাজানো হলো তাদের থাকার কামরাটি। উন্নত মানের খাবার পরিবেশন করা হতো তাদের। হাবশীদের নেতা তাদের সামনে সিজদায় পড়ে গিয়ে বিড় বিড় করে মন্ত্র পাঠ করতো। সাধারণ হাবশীদের কোন সুযোগ ছিল না তাদের সামনে আসার।

একদিন তাদেরকে গাছের ডাল-পাতা দিয়ে বানানো পালকিতে করে নদীতে গোছল করাতে নিয়ে গেল। দু'জনই জানতো, কেন তাদের এত আদর যত্ন করা হচ্ছে। কিন্তু কবে তাদের 'বলী' দেয়া হবে এটা তাদের জানা ছিল না।

রাতে যখন তারা নির্জন কামরায় ঘুমিয়ে থাকতো তখনো বাইরে আট দশজন হাবশী পাহারায় থাকতো সে কামরার।

কমাণ্ডার রাতে উঠে বাইরে তাকিয়ে দেখতো পালানোর কোন সুযোগ আছে কিনা। কিন্তু যতবারই সে বাইরে তাকিয়েছে ততবারই একরাশ হতাশা তার সব আশা আকাঙ্খা গুড়িয়ে দিয়েছে। পালানোর কোন সুযোগ বা সম্ভাবনা মোটেই ছিল না সেখানে।

এক রাতে হাবশীদের দু'জন ধর্মীয় নেতা কামরায় প্রবেশ করলো। কমাণ্ডার ও জোহরা দু'জনই তখন গভীর ঘুমে বিভোর। তাদেরকে ঘুম থেকে জাগানো হলো। তারা বুঝতে পারলো, তাদের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে।

ধর্মীয় নেতারা তাদের সামনে সিজদায় পড়ে গেল। সিজদা থেকে উঠে তাদেরকে নিয়ে গেল বাইরে। বাইরে দুটো সুসজ্জিত পালকি রাখা। ধর্মীয় নেতারা এক পালকিতে কমাণ্ডার ও অপর পালকিতে জোহরাকে বসিয়ে দিল।

চার বেহারার পালকি। কমাণ্ডার ও জোহরা পালকিতে চড়ে বসতেই বেহারারা কাঁধে তুলে নিল পালকি, চলতে শুরু করলো।

আগে আগে যাচ্ছে দুই ধর্মীয় নেতা, পেছনে দুই পালকি। পালকির বেহারারা গুন গুন করে গান গাচ্ছিল। প্রতিটি পালকির পেছনেই বর্শা হাতে চলছে দু'জন করে হাবশী প্রহরী।

কমাণ্ডার ও জোহরা একদম নীরব। সুবোধ বালকের মত ধর্মীয় নেতাদের নির্দেশ মেনে চলছে।

পাহাড়ী এলাকা থেকে বের হয়ে পালকি যাচ্ছিল নদীর দিকে।

কমাণ্ডার দেখলো, আকাশের চাঁদ পশ্চিম দিগন্তে হেলে পড়েছে। বুঝলো, অর্ধেকের বেশী পার হয়ে গেছে রাত।

নদীর পাড়ে গিয়ে বেহারারা পালকি নামালো। ধর্মীয় নেতা পালকি থেকে কমাণ্ডার ও জোহরাকে নামিয়ে তাদের পোশাক পাল্টাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। সবাইকে নির্দেশ দিল, 'পোশাক পাল্টাবার সময় কেউ ওদের দিকে তাকাবে না।'

চাঁদের আলোয় কমাণ্ডার দেখলো, বর্শাধারী দুই রক্ষী ও পালকির হাবশী বেহারারা তাদের দিকে পিছন ফিরে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। ধর্মীয় নেতার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করছে তারা।

এই সুযোগ, কমাণ্ডার বাঘের মত লাফিয়ে চোখের পলকে এক হাবশীর বর্শা কেড়ে নিয়ে সেই বর্শা তার বুকে বিদ্ধ করলো। তারপর মুহূর্তের মধ্যেই তা টেনে বের করে আঘাত করলো পাশের বর্শাধারীকে।

মুহূর্তের মধ্যে দুই প্রহরী ঢলে পড়লো মৃত্যুর কোলে। এরপর কমাণ্ডার জোহরার রক্ষীদের একজনকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারল বর্শা। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠল, 'জোহরা, পালাও!'

ঘটনা এত আকস্মিক ও অভাবিত ছিল যে, কেউ এরকম পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত ছিল না। কমাণ্ডারের আচরণ ছিল খুবই স্বাভাবিক, হাবশীরা ধারনাও করতে পারেনি, সে এমন মারমুখী হয়ে যাবে। তাই তারা কিছু বুঝে উঠার আগেই সে তিনজন প্রহরীকে ধরাশায়ী করে অন্য একটি বর্শা কুড়িয়ে নিতে গেল।

একজন দক্ষ সৈনিক ও কমাণ্ডারের দক্ষতা, ক্ষীপ্রতা, সাহসিকতা ও বুদ্ধির দীপ্তি প্রকাশ পাচ্ছিল তার প্রতিটি নড়াচড়ায়।

কমাণ্ডারের চিৎকার শুনেই জোহরা ঘুরে দাঁড়িয়েছিল তার দিকে। একই সাথে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল অন্য সবাই।

বর্শাধারী বর্শা উঁচিয়ে ছুটে গেল কমাণ্ডারকে আঘাত করতে। জোহরা তার পাশে পড়ে যাওয়া প্রহরীর বর্শা তুলে নিয়ে ছুটল প্রহরীর পেছনে।

কমাণ্ডার বর্শা উঠিয়েই দেখতে পেল ওদের। সে হাতের বর্শা দিয়ে ঠেকিয়ে দিল প্রহরীর আঘাত। প্রহরী দ্বিতীয়বার আঘাত করার সুযোগ পেল না, জোহরার হাতের বর্শা প্রহরীর পিঠ দিয়ে ঢুকে বুক দিয়ে বেরিয়ে গেল।

কমাণ্ডার বললো, 'সাবাশ জোহরা সাবাশ! বর্শা হাতে তোমাকে এক মহীয়সী যোদ্ধার মতই লাগছে।'

যদিও ওরা মাত্র দু'জন এবং প্রতিপক্ষে এখনো দশজন জীবিত, কিন্তু ওই দশজনই নিরস্ত্র। অস্ত্রধারী চার প্রহরীর করুণ মৃত্যুর বিভীষিকা তাদের চোখে মুখে।

ধর্মগুরু দু'জন চিৎকার দিয়ে বললো, 'দেবতার দোহাই! ওদের পালাতে দিও না। ধরো, ধরো ওদের!'

কিন্তু ওই চিৎকার পর্যন্তই, তারা নিজেরাও এগিয়ে এলো না, আর তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে বেহারারাও এগিয়ে এলো না।

একদিকে খালি হাতে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা দশজন নিরস্ত্র মানুষ, অন্যদিকে বর্শা উঁচিয়ে বেপরোয়া ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকা

এক পুরুষ ও এক নারী।
কেউ কারো দিকে এগিয়ে গেল না, নিরাপদ দূরত্বে দুই দল পরষ্পরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।
কয়েকটি নিস্তব্ধ মুহূর্ত পার হলো ঘটনাবিহীন। হঠাৎ হাবশীদের ধর্মীয় দুই নেতা পিছন ফিরে দে ছুট। পড়িমড়ি করে পালাতে লাগলো ওরা। তাদের দেখাদেখি ছুটল বেহারারাও।
কমাণ্ডার তাদের বেশী দূর যেতে দিল না, বর্শা হাতে ছুটলো তাদের পেছনে। জোহরাও দৌড় দিলো তার দেখাদেখি।
দু'জন ধর্ম নেতাই নিহত হলো। মারা গেল বেহারাদের দু'জন। বাকীরা নদীর পাড়ে জঙ্গলের ভেতর লুকিয়ে পড়লো। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাদের আর পাওয়া গেল না।
কমাণ্ডার দ্রুত জোহরাকে নিয়ে ছুটল তাদের ফাঁড়ির দিকে। কিছু দূর এগুতেই দেখতে পেল দুই টহল প্রহরী ঘোড়ার পিঠে চড়ে পাহারা দিতে দিতে এদিকেই এগিয়ে আসছে।
কমাণ্ডার চিৎকার করে বললো, 'জলদি এদিকে এসো।'
প্রহরীরা কমাণ্ডারের ডাক চিনতে পারলো। দ্রুত ছুটে এলো ওরা। কমাণ্ডার ওদেরকে বললো, 'তোমাদের ঘোড়া আমাদের দাও, আমরা এখান থেকেই কায়রো রওনা হয়ে যাবো। তোমরা দু'জন ফাঁড়িতে গিয়ে নতুন ঘোড়া নিয়ে এসো। কেউ আমাদের খোঁজ করলে বলবে, তোমরা আমাদের দেখোনি।'
প্রহরী বললো, 'এ কয়দিন কোথায় ছিলেন আপনারা? এদিকে আমরা আপনাদের খুঁজে হয়রান!'

'এ সব কথা পরে শোনো। এখন ফাঁড়িতে ফিরে যাও।'
প্রহরী দু'জন পায়ে হেঁটে রওনা দিল ক্যাম্পের দিকে। কমাণ্ডার ও জোহরা আলাদা আলাদা ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসলো।
কমাণ্ডার জোহরাকে বললো, 'খুব দ্রুত ছুটতে হবে। ভয় পেয়ো না, ঘোড়া তোমাকে ফেলে দেবে না, ভয়ের কোন কারণ নেই।'
ঘোড়া তাড়া করলো কমাণ্ডার। কমাণ্ডারের ঘোড়া যখন প্রচণ্ড জোরে ছুটতে শুরু করলো, জোহরা সে ঘোড়ার গতি দেখেই ভয়ে চিৎকার করে উঠলো।
কমাণ্ডার ঘোড়া থামিয়ে ফিরে এলো জোহরার কাছে। তারপর জোহরাকে নিজের ঘোড়ার ওপর বসিয়ে জোহরার ঘোড়ার লাগাম তার ঘোড়ার সাথে বেঁধে নিল। জোহরাকে বললো, 'শক্ত করে আমার কোমর ধরে থাকো।'
অশ্ব আবার পূর্ণ উদ্যমে ছুটে চললো। কমাণ্ডার পাহাড়ী এলাকা থেকে বহু দূর দিয়ে ছুটে চললো কায়রোর দিকে।
কায়রোর পথ তার নখদর্পনে। তখনো তারা দুই মাইল পথও অতিক্রম করেনি, একদিক থেকে আওয়াজ এলো, 'দাঁড়াও, থামো! তোমরা কে?'
কমাণ্ডার থামলো না, ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে ছুটলো আরো জোরে। সাথে সাথেই চারটি ঘোড়া তাদের পিছু নিলো।
কমাণ্ডার তার ঘোড়ার গতি আরও বাড়িয়ে দিতে চাইল, কিন্তু ঘোড়া দুই সওয়ারী নিয়ে এরচে জোরে আর চলতে পারছিল না। কমাণ্ডার চেষ্টা করলো, অন্য ঘোড়ায় চড়ে বসতে। কারণ

সে এতক্ষণ বাহন ছাড়া থাকায় কম ক্লান্ত ছিল। কিন্তু জোহরাকে নিয়ে অন্য ঘোড়ার পিঠে যাওয়াও সম্ভব ছিল না।
চাঁদ মাথার ওপর থেকে আরো হেলে পড়েছে। চাঁদের সেই ম্লান আলোতেও বহু দূর পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। চারটি ঘোড়াই তাদের খুব কাছাকাছি চলে এলো।
দুটি তীর ছুটে এসে কমাণ্ডারের পাশ কেটে চলে গেল সামনে। সাথে সাথে আওয়াজ হলো, 'যদি না থামো তো তীর তোমার মাথার মগজে ঢুকে যাবে।'
কমাণ্ডারের মাথায় তখন একটাই ভাবনা, যদি থামি তবে মৃত্যু অবধারিত। এ লোকেরা নিশ্চয় আমাদের হাবশীদের হাতে তুলে দেবে। হাবশীরা আমাদেরকে হাতে পেলে আজ রাতেই বলী দিয়ে দেবে ওদের দেবতার সামনে। সুতরাং ধরা দেয়ার চাইতে পালানোই উত্তম। তাতে কিছুটা হলেও বাঁচার সম্ভাবনা থাকতে পারে।
সে ঘোড়া ডানে বায়ে ঘুরিয়ে চালাতে লাগলো যাতে তীর লক্ষ্যচ্যুত হয়। কিন্তু এটা ছিল তার মস্তবড় ভুল।
ধাওয়াকারীরা এর ফলে দ্রুত তাদের দূরত্ব কমিয়ে আনতে সক্ষম হলো। শেষে তারা এতটা কাছে এসে পড়লো যে, কমাণ্ডার ও জোহরা তাদের ঘেরের মধ্যে পড়ে গেল।
কমাণ্ডারের গায়ে তখনো বিভিন্ন রংয়ের পাখীর পালকের বিচিত্র পোশাক। জোহরারও তাই।
ঘেরাওকারীরা ওদের এই বিচিত্র পোশাক দেখে অবাক হলো। ও যে মিশরীয় বাহিনীর এক কমাণ্ডার পোশাক দেখে তা

বুঝার কোন উপায় ছিল না। ফলে কমাণ্ডারকে চিনতে পারল না ওরা।
একজন জিজ্ঞেস করলো, 'তোমরা কে?'
অপরজন বললো, 'কি জিজ্ঞেস করছো? দেখছো না এরা সুদানী, কেমন অদ্ভুত পোশাক পরে আছে?'
তাদের কথায় ভুল ভাঙল কমাণ্ডারের। সে হেসে বললো, 'বন্ধুগণ, আমি তোমাদের বাহিনীর এক কমাণ্ডার।'
তারপর সে জোহরার পরিচয় দিলো এবং সমস্ত ঘটনা ওদের খুলে বললো।
এ চারজন মিশরীয় সৈন্য শত্রুসেনা খুঁজে বেড়াচ্ছিল। সুদানী সৈন্যরা কোথায় লুকিয়ে আছে এবং তাদের আস্তানা কোথায় তা খুঁজে বের করার জন্য যেসব দল চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল তাদেরই একটা দল এরা। তারা কমাণ্ডার ও জোহরাকে সঙ্গে নিয়ে কায়রোর দিকে যাত্রা করলো।
দীর্ঘ রাস্তা অতিক্রম করে পরের দিন তারা কায়রো গিয়ে পৌঁছলো।
প্রথমেই তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হলো আলী বিন সুফিয়ানের কাছে। আলী কমাণ্ডারের কাছ থেকে পুরো কাহিনী শুনে ওদের নিয়ে গেলেন সুলতান তকিউদ্দীনের কাছে।
তকিউদ্দীনকে তারা জানালো, 'প্রায় দশ হাজার সুদানী হাবশী সৈন্য আবু সাম্বালের দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে লুকিয়ে আছে। তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে সেনাপতি আলকিন্দি।'
তকিউদ্দীন সঙ্গে সঙ্গে সেনা বাহিনীর একটি দলকে সেখানে

অভিযান চালানোর নির্দেশ দিলেন।

সুলতান আইয়ুবীর যুদ্ধ পদ্ধতি অনুযায়ী প্রথমে অশ্বারোহী বাহিনীকে রাখা হলো। এ বাহিনীতে সৈন্য সংখ্যা কম। তাদের দুই পাশে ও পিছনে রাখা হলো আরো তিনটি দলকে। এদের পেছনে রাখা হলো মূল ফোর্স। সবার পেছনে সংরক্ষিত রিজার্ভ বাহিনী।

তাদের জানা ছিল, আবু সাম্বালের পাহাড়ী এলাকাটা বেশ বিস্তৃত। এলাকাটা কেবল দুর্গম নয়, অঞ্চলটা বেশ দুর্ভেদ্য।

যাত্রার সময় তকিউদ্দীন সেনাবাহিনীকে বললেন, 'কেল্লা অবরোধের মত তোমরা পুরো এলাকা ঘেরাও করে ফেলবে। সঙ্গে কমাণ্ডো বাহিনী নিয়ে রওনা হচ্ছি আমি। পাহাড়ের ওপর ওরাই উঠবে।'

কমাণ্ডো বাহিনীকে নিজের কমাণ্ডে নিয়ে আলকিন্দিকে শায়েস্তা করার জন্য রওনা হয়ে গেলেন সুলতান তকিউদ্দীন।

ভোর পর্যন্ত ভয়ে জঙ্গলে লুকানো ছয় বেহারার কেউ আর নড়াচড়া করার সাহস পায়নি। যখন ভোর হলো, জঙ্গল থেকে বের হয়ে ছুটল পাহাড়ের দিকে। ওখানে পৌঁছে সোজা গিয়ে ঢুকলো আলকিন্দির কামরায়। হাঁপাতে হাঁপাতে বললো সব ঘটনা।

আলকিন্দি সঙ্গে সঙ্গে সুদানী ও খৃস্টান উপদেষ্টাদের খবর দিল তার কামরায় আসার জন্য। সব শুনে খৃস্টান উপদেষ্টারা বললো, 'হাবশীদের কাছ থেকে এ খবর গোপন রাখতে হবে।'

তারপর উপদেষ্টাদের নিয়ে আলকিন্দি চললো ঘটনাস্থলে। সঙ্গে নিল সেই ছয় বেহারাকে। নদীর পাড়ে পৌঁছলো ক্ষুদ্র দলটি। দুই ধর্মীয় নেতা, চারজন প্রহরী ও দুই বেহারার লাশ পড়েছিল সেখানে।

সবাই লাশের দিকে তাকিয়ে আছে, এক বেহারা বললো, 'কমাণ্ডার যে এমন বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়বে আমাদের ওপর, আমরা কেউ তা ভাবতেও পারিনি।'

'কমাণ্ডার! কোন কমাণ্ডার?' আলকিন্দি বিস্মিত হয়ে বললো।

'যাকে বলী দেয়ার জন্য আনা হয়েছিল, সে ওই পাশের ক্যাম্পের সেনা কমাণ্ডার। নর্তকীসহ তাকেই তো ধরেছিল আমাদের লোকেরা!'

'এখন কোথায় সে?'

'আমাদের প্রহরীর হাত থেকে বর্শা কেড়ে নিয়ে আটজন লোককে হত্যা করে মেয়েটিকে নিয়ে পালিয়ে গেছে।'

ভীষণ চমকে উঠলো আলকিন্দি। বললো, 'বলো কি! সে তো আমাকে দেখে ফেলেছে! আমি তাকে খেয়াল না করলেও সে নিশ্চয় আমাকে ভাল করে দেখেছে এবং আমাকে চিনে ফেলেছে। এখন উপায়?'

'ঘাবড়াচ্ছেন কেন? এত মারামারির পর নিশ্চয়ই সে ক্লান্ত হয়ে কোথাও লুকিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে। আমাদের যে শক্তি সে দেখেছে তাতে গর্ত থেকে সহসা সে মুখ বের করবে বলে আমার মনে হয় না।' বললো এক খৃস্টান উপদেষ্টা।

'আপনি তাকে চেনেন না! সে এক মুহূর্তও কোথাও বিশ্রাম

নেবে না। সোজা ছুটে যাবে কায়রো। খোঁজ নিয়ে দেখুন, ইতিমধ্যে সে কায়রোর অনেক পথ এগিয়ে গেছে।'

'ঠিক আছে, আপনার সন্দেহ কতটুকু সত্যি, ফাঁড়িতে খোঁজ নিলেই জানা যাবে।'

আলকিন্দি বললো, 'এখন তাঁকে ফাঁড়িতে গিয়ে খোঁজ করা বৃথা। বেহুদা সময় নষ্ট করার কোন অবকাশ নেই আমাদের। আমরা সবার অজান্তে কায়রোতে আক্রমণ চালানোর আশা করেছিলাম, কিন্তু আমরা বড্ড দেরী করে ফেলেছি। আক্রমণ করতে হলে এখনই করতে হবে, নইলে আমরা আমাদের অজ্ঞাতেই মারা পড়ে যাবো। আমি আমার সেনাবাহিনীর অবস্থা জানি, তারা আমাদের আস্তানার সন্ধান পেলে বাজপাখীর মত উড়ে এসে টুটে পড়বে আমাদের ওপর।'

উপদেষ্টারা বেহারা ছয়জনকে বললো, 'তোমরা এক কাজ করো, দ্রুত হাবশীদের লাশগুলো নদীতে ভাসিয়ে দাও। যদি হাবশীরা জেনে যায় যে, তাদের ধর্মীয় নেতা ও তাদের রক্ষীরা মারা গেছে আর যাদের কোরবানী করার জন্য আনা হয়েছিল তারা পালিয়ে গেছে, তবে হাবশীরা কায়রো যাওয়ার পরিবর্তে সোজা খার্তুম রওনা দেবে।'

আরেক উপদেষ্টা বললো, 'আমরা এখান থেকে ফিরেই হাবশীদের সামনে ঘোষণা করবো, দেবতার নির্দেশে নীলনদের পাড়ে বলীদান অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়েছে। দেবতা হুকুম দিয়েছে, অবিলম্বে শত্রুদের ওপর আক্রমণ চালাতে।'

তারা ছয় বেহারাকে বললো, 'খবরদার! কোন হাবশী যদি

আসল ঘটনা জানতে পারে তবে তোমাদের গর্দান উড়িয়ে দেয়া হবে।'

অন্য একজন বললো, 'উড়িয়ে দেয়া হবে কি, এখনি উড়িয়ে দাও, যাতে কোন ভয় না থাকে!'

বেহারারা হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। বললো, 'আপনারা আমাদের মা-বাপ। দেবতার কসম, আমরা এ কথা কাউকে বলবো না। যদি বলি তো আমাদের এবং আমাদের বউ-বেটিদেরও আপনাদের হাওলা করে দেবো।'

আলকিন্দি উপদেষ্টাদের নিয়ে আস্তানায় ফিরে গেল। জরুরী সংকেত বাজিয়ে সব হাবশীদের সমবেত করা হলো মাঠে। তাদের সামনে দাঁড়িয়ে আলকিন্দি ঘোষণা করলো, 'দেবতার ইচ্ছামত কাল রাতে একজন পুরুষ ও একটি নারীকে নীলনদের পাড়ে বলী দেয়া হয়েছে। দেবতা সন্তুষ্ট হয়ে আজই আমাদেরকে যুদ্ধ যাত্রা করার নির্দেশ দিয়েছে। তোমাদেরকে এক ঘন্টা সময় দেয়া হলো। যারা দেখতে চাও নদীর পাড়ে গিয়ে দেখে আসতে পারো দেবতা বলী গ্রহণ করেছেন কি না। ওখান থেকে ফিরেই তোমরা যার যার হাতিয়ার নিয়ে নিজ নিজ দলে শামিল হয়ে যাবে যুদ্ধে রওনা হওয়ার জন্য।'

হাবশীরা ছুটল নদীর দিকে। নদীর পাড়ে গিয়ে দেখলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা রক্ত, এক পাশে পড়ে আছে দুটো পালকি।

একজন সেই রক্তের দিকে ইশারা করে ঘোষণা করলো, 'এই সে মনোনীত পুরুষ ও নারীর রক্ত, যাদেরকে এখানে গত

রাতে বলীদান করা হয়েছে।'

হাবশীরা সন্তুষ্ট চিত্তে ফিরে এলো আস্তানায়। রিপোর্ট করলো যার যার কমাণ্ডারের কাছে গিয়ে।

হাবশী সৈন্যদের সংখ্যানুপাতে গ্রুপ ভাগ করে ফেলা হলো। তীরান্দাজরা পৃথক হয়ে গেল তাদের দলে। বর্শাধারীরা সমবেত হলো বর্শাধারীদের ওখানে। যুদ্ধের পরিকল্পনা অনুযায়ী তাদেরকে সাজানো শেষ হলে হাবশীদেরকে নিয়ে পাহাড়ী এলাকা থেকে বের হয়ে এলো আলকিন্দি। হাবশীদের নিয়ে ছুটে চললো কায়রোর দিকে।

হাবশীরা যুদ্ধের গান গাইতে গাইতে অগ্রসর হচ্ছিল। দশ হাজার নিগ্রোর বিশাল কাফেলা। বীর দর্পে এগিয়ে চলেছে মরুভূমিতে ধূলিঝড় তুলে।

রাত হয়ে গেলে এক স্থানে ক্যাম্প করে বিশ্রাম নিল ওরা। পরদিন সকালেই আবার শুরু হলো ওদের যুদ্ধ যাত্রা।

পাহাড়ী অঞ্চল অনেক পিছনে পড়ে রইলো। এগিয়ে চললো কাফেলা। দিনভর পথ চললো ক্লান্তিহীনভাবে। সূর্য অস্ত গেল। কায়রো এখনো অনেক দূর।

আরও একটি রাত পথেই কাটাতে হলো তাদের। হাবশী সৈন্যদের ক্যাম্প করতে বলা হলো। তারা খেয়ে দেয়ে মরুভূমিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে নির্বিঘ্নে ঘুমিয়ে পড়লো।

মধ্যরাতের পর।

হাবশীরা ঘুমিয়েছিল। মিশরের কমাণ্ডো বাহিনী অতর্কিতে

ঝাঁপিয়ে পড়লো ওদের ওপর। মরুভূমিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে শুয়ে থাকা সুদানী হাবশী সৈন্যরা কিছু টের পাওয়ার আগেই একদিক থেকে কমাণ্ডো অশ্বারোহী বাহিনীর একটি দল মার মার, কাট কাট করে ঝড়ের বেগে বয়ে গেল ওদের ওপর দিয়ে। বহু হাবশী সৈন্য তাদের ঘোড়ার পদতলে পিষে মারা গেল।

হাবশীদের মাঝে মহা হুলুস্থুল পড়ে গেল। আহতদের আর্ত চিৎকারে ভারী হয়ে উঠল মরুর বাতাস। কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল কিছুই বুঝতে পারলো না তারা। মাত্র কয়েক মিনিটের একটি ঝড়, তারপর সব সুনসান। কোথাও কোন বাহিনীর ছায়াও দেখা যাচ্ছে না।

সম্বিত ফিরে পেয়ে সৈন্যরা আহতদের ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে লেগে গেল। বাকীরা এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে কোত্থেকে এই আকস্মিক ঝড় এলো তাই নিয়ে শঙ্কিত চিত্তে জটলা করছে। এ সময় হঠাৎ অন্য পাশ থেকে বয়ে গেল আরও একটি ঝড়। প্রচণ্ড গতিতে কমাণ্ডোরা আক্রমণ চালালো ওদের ওপর। অশ্ব পদতলে পিষ্ট হওয়া ছাড়াও বর্শা ও তলোয়ারের আঘাতে ধরাশায়ী হলো অসংখ্য হাবশী সেনা। দশ হাজার হাবশীর বিশাল বাহিনীর একপাশ দিয়ে ঢুকে অন্য পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল মিশরীয় বাহিনী। মুহূর্তে হারিয়ে গেল দৃষ্টির আড়ালে।

আলকিন্দি দ্রুত অবশিষ্ট ফৌজকে সংগঠিত করে প্রস্তুত হয়ে গেল পরবর্তী হামলা মোকাবেলার জন্য। সুদানী কমাণ্ডার ও খৃস্টান উপদেষ্টাদের বললো, 'এ গেরিলা আক্রমণ বলে দিচ্ছে,

আমাদের প্রতিটি নড়াচড়া মিশরীয় বাহিনী প্রত্যক্ষ করছে।'
আলকিন্দি বললো, 'সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর এ এক বিশেষ ধরনের যুদ্ধ। এখন আমরা সামনেও অগ্রসর হতে পারবো না, পিছাতেও পারবো না। যেদিকেই কদম উঠাবো সেদিকেই বিপদের পাহাড় ভেঙ্গে পড়বে।
তোমরা এখন যতই চেষ্টা করো মিশরের সেনাবাহিনীর সাথে মুক্ত মরুভূমিতে যুদ্ধ করে টিকতে পারবে না। এমনকি তোমরা এখন অক্ষত অবস্থায় পালাতেও পারবে না। আমাদের সমস্ত পরিকল্পনা বানচাল হয়ে গেছে। কায়রোবাসী শুধু সজাগই হয়নি, তারা তাদের সেনাবাহিনীও পাঠিয়ে দিয়েছে। এখন বাঁচার কোন পথ নেই। তবে পিছিয়ে গিয়ে ওই পাহাড়ের আড়ালে আশ্রয় নিয়ে যদি সেখান থেকে যুদ্ধ করতে পারো, তাহলে হয়তো কিছুটা রক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।'
'কেন, আমরা কি মিশরীয় সৈন্যদের মরুভূমিতে খুঁজে খুঁজে বের করে মারতে পারবো না?' এক সুদানী কমাণ্ডার বললো।
আলকিন্দি বললো, 'আমি মিশর বাহিনীর সেনাপতি, তোমরা আমার চেয়ে বেশী জানো না, এই সৈন্যদের সাথে কেমন কৌশলে লড়তে হবে।'

পরদিন ভোর বেলা।
হাবশী সৈন্যরা দেখলো, তাদের চারপাশে ছড়িয়ে আছে সহযোদ্ধাদের অসংখ্য লাশ। সে সব লাশের কোন সৎকার না করেই আলকিন্দির হুকুমে হাবশী সেনাদল যুদ্ধক্ষেত্র থেকে

ফিরে চললো। পেছনে খোলা মরুভূমিতে পড়ে রইলো বন্ধুদের লাশগুলো।

আলকিন্দি ঠিকই বলেছিল, ওদের প্রতিটি নড়াচড়া মিশরীয় সৈন্যরা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিল। মিশর বাহিনীর লক্ষ্য ছিল আলকিন্দির গতিবিধির ওপর।

হাবশী সৈন্যদের পিছাতে দেখে তকিউদ্দীন তাৎক্ষণিকভাবে বুঝে নিলেন, আলকিন্দি পাহাড়ী এলাকায় অবস্থান নিয়ে যুদ্ধ করার প্ল্যান করেছে।

তিনি কালবিলম্ব না করে সঙ্গে সঙ্গে অশ্বারোহীদের একটি দলকে পাহাড়ী এলাকায় পাঠিয়ে দিলেন। তাদের পিছন পিছন পাঠালেন তীরন্দাজ ও পদাতিক বাহিনীকে।

তিনি অধিকাংশ দক্ষ সেনাদের নিজের কাছে রেখে তাদের নিয়ে হাবশী বাহিনীকে অনুসরণ করে বহু দূর দিয়ে পাশাপাশি চলতে লাগলেন।

রাস্তাতেই রাত হয়ে গেল। হাবশীরা রাতে একস্থানে ক্যাম্প করে রাত কাটানোর ব্যবস্থা নিল।

আজ আর ওরা অরক্ষিত অবস্থায় ঘুমোতে গেল না। হাবশীদের একটি সেনাদলকে সজাগ রাখা হলো। তারা সবাই দক্ষ তীরন্দাজ। তারা তীর ধনুক নিয়ে সম্ভাব্য হামলা মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত হয়ে বসে রইল।

রাতে মিশরীয় কমাণ্ডোরা হামলা করলো। বেপরোয়া তীর চালাতে লাগলো হাবশী তীরন্দাজরা। এতটা প্রতিরোধ আশা করেনি কমাণ্ডো বাহিনী, ফলে বহু অশ্বারোহী কমাণ্ডো আহত

ও শহীদ হয়ে গেল।

এ হামলায় মিশরীদের ভীষণ ক্ষতি হলো ঠিকই, কিন্তু হাবশীদের মনোবল একেবারেই ভেঙ্গে গেল। যুদ্ধ করার সাহস ও শক্তি দুটোই হারিয়ে ফেললো ওরা।

যেখানে তাদের প্রত্যাশা ছিল, অতর্কিতে হামলা চালিয়ে ওরা কায়রো দখল করে নেবে, সেখানে পথেই এ ঝটিকা হামলায় নাস্তানাবুদ হওয়ার ঘটনা ছিল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। তাছাড়া ওরা কেউ গেরিলা যোদ্ধা ছিল না, নিয়মিত লড়াই ও সম্মুখ যুদ্ধের ট্রেনিং দিয়ে কমাণ্ডোদের মোকাবেলা করতে গিয়ে ওরা নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হচ্ছিল। এই অভিজ্ঞতা ছিল তাদের চিন্তা ও ধারনার অতীত।

শত্রু সেনাদের তারা দেখতেই পায় না, অথচ তারা ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা চালিয়ে মুহূর্তে আবার অদৃশ্য হয়ে যায়।

হাবশীরা মিশরীয় বাহিনীর এই লড়াই পদ্ধতি ও সাথীদের অসংখ্য লাশের স্মৃতি নিয়ে যখন পাহাড়ী এলাকায় এসে পৌঁছলো, সূর্য ডুবে যেতে তখনও বেশ বাকি।

তারা পাহাড়ী অঞ্চলে প্রবেশ করলো। আলকিন্দি এ বাহিনীকে এক জায়গায় জড়ো না রেখে পাহাড়ের উপরে, নিচে ও পাদদেশে মোতায়েন করে দিলো।

হুকুম পাওয়া মাত্র সৈন্যরা নিজ নিজ অবস্থানে পজিশন নিতে শুরু করলো। মাত্র অর্ধেক সৈন্য পাহাড়ের ওপর চড়েছে, তাদের উপরে ওপর থেকে তীর বর্ষণ শুরু হলো।

মিশরের ক্ষিপ্রগতি সৈন্য দল আগেই সেখানে গিয়ে পজিশন

নিয়ে বসেছিল, ওরা তীরের আওতায় আসতেই শুরু করলো তীর বর্ষণ।

হাবশী সৈন্যরা চিৎকার ও শোরগোল করে পাহাড়ের আড়ালে পালালো। তারপর সেখান থেকেই তারা পাল্টা জবাব দিতে লাগলো তীর ছুঁড়ে।

হাবশীদের অর্ধেক সৈন্য তখনও যুদ্ধের আওতার বাইরে। তাদেরক পিছনে সরে যেতে বলা হলো।

আলকিন্দি যুদ্ধরত সৈন্যদের পাহাড়ের উপরে উঠে ওপর থেকে তীর চালাতে আদেশ দিল, কিন্তু যত বার ওরা উপরে উঠার চেষ্টা করলো ততবারই তকিউদ্দীনের সৈন্যদের তীর বৃষ্টির সম্মুখীন হয়ে পিছু হটতে বাধ্য হলো ওরা।

তকিউদ্দীন তার তীরন্দাজদের বললেন, 'ওদের যখন উপরে উঠার এতই শখ, আবার যখন চেষ্টা করবে তাদের একটু সুযোগ দিও।'

তকিউদ্দীন এ হুকুম দিয়েই সরে গেলেন পাশের টিলায়। ওখানেও তার একদল তীরন্দাজ বসেছিল। আলকিন্দির একদল সৈন্য তীর নিক্ষেপ করতে করতে কৌশলে উপরে উঠে গেল। দলটি উপরে উঠে গেলে তকিউদ্দীন সেই টিলার তীরন্দাজদের হুকুম দিলেন, 'তীর চালাও!'

আচমকা উল্টো দিক থেকে তীর ছুটে আসায় পিছন দিক থেকে আক্রান্ত হলো দলটি।

তকিউদ্দীন চতুর্দিক থেকে ওদের ঘেরাও করে ফেললেন। অশ্বারোহীদের পাঠিয়ে দিলেন নদীর পাড়ে।

চতুর্দিক দিয়ে অবরোধের মধ্যে পড়ে গিয়ে বেপরোয়া হয়ে পড়লো হাবশী সৈন্যরা। তারা প্রাণপণে চেষ্টা করলো মিশরীয় বাহিনীর মোকাবেলা করতে।

আসোয়ানের দুর্গম পর্বত শ্রেণী ক্ষতবিক্ষত হচ্ছিল এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে। সমতলে, পাহাড় চুড়ায় দু'দলের তীর বর্ষিত হচ্ছিল বৃষ্টির মত।

এবার ময়দানে নেমে এলো অশ্বারোহী বাহিনী। পাহাড়ের পাদদেশে যুদ্ধের নতুন ময়দান তৈরী করলো অশ্বারোহীরা। তারা একে অন্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো বাঁধভাঙা জোয়ারের মত।

এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ দেখতে দেখতে পশ্চিম আকাশের রক্তিম সূর্য এক সময় হারিয়ে গেল অন্ধকারের অতলে। সময়ের স্রোত বেয়ে নেমে এলো রাত। এই রাত হাবশীদের অন্তরে ভয় ও আতঙ্কের এক চরম বিভীষিকা ছড়িয়ে দিল। জড়োসড়ো হয়ে আত্মরক্ষায় ব্যস্ত হয়ে গেল ওরা।

অপর দিকে মিশরীয় বাহিনীকে পেট্রোল ভেজা অগ্নি বোমা নিক্ষেপ করার আদেশ দিলেন তকিউদ্দীন। তারা স্থানে স্থানে অগ্নি বোমা নিক্ষেপ করতে লাগলো।

এরপর অগ্নি বোমার আলোতে দেখে দেখে শুরু করলো অগ্নি তীর নিক্ষেপ। রাতের অন্ধকার আলোকিত হয়ে উঠলো চারদিকের অগ্নি শিখায়। এই আলোতেই যুদ্ধ চললো রাতভর।

তখনো ভোরের আলো ফুটে উঠেনি, হাবশীরা একেবারে নীরব

হয়ে গেল। তারা মাটির তলের ফেরাউনের মহলগুলোতে গিয়ে লুকালো। মিশরীয় বাহিনী সে সব গোপন কক্ষে তল্লাশী চালিয়ে বহু কষ্টে তাদের বিতাড়িত ও বন্দী করলো।

সকাল হলো।

আলকিন্দির লাশ পাওয়া গেল মাঠের এক কোণায়। কোন তীর বা তলোয়ারের আঘাতে মারা যায়নি সে, নিজের তলোয়ার দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

কয়েকজন সুদানী কমাণ্ডার ও খৃস্টান উপদেষ্টা ধরা পড়লো। হাবশী যুদ্ধ বন্দীর সংখ্যা ছিল এক হাজারেরও বেশী।

সুলতান তকিউদ্দীন যুদ্ধের ময়দান থেকেই সুলতান আইয়ুবীর কাছে এ সাফল্যের সংবাদ দিয়ে এক কাসেদকে পাঠিয়ে দিলেন। তাকে বললেন, 'সুলতান নিশ্চয়ই খুব পেরেশান আছেন। তাকে জলদি গিয়ে এখানকার সংবাদ পৌছে দাও। বলবে, আল্লাহ তার বান্দাদের বিজয় দান করেছেন।'

মুসলিম বিশ্বের যে এলাকায় আজ সিরিয়ার এক শ্রেণীর মুসলমান লেবাননী খৃস্টানদের সাথে মিলে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামীদের সামরিক শক্তি বলে স্তব্ধ করে দিতে চাচ্ছে, সেখানে আটশ বছর আগে এক শ্রেণীর মুসলমান শাসক সুলতান নুরুদ্দিন জঙ্গীর নয় বছরের সন্তানকে সামনে রেখে খৃস্টানদের সাহায্য ও সহযোগিতায় সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর বিরুদ্ধে সামরিক জোট গঠন করেছিল। অথচ নুরুদ্দিন জঙ্গীর একমাত্র অনুসারী মুসলিম হিতৈষী ছিলেন

সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী।

খৃস্টানদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে মুসলমানরাই মুসলমানদের রক্তের পিপাসু হয়ে উঠেছিল। সে সময় ফিলিস্তিন ছিল খৃস্টানদের অধিকারে। আজ তার কর্তৃত্ব অভিশপ্ত ইহুদীদের হাতে।

সুলতান আইয়ুবী মুসলমানের সেই প্রথম কেবলা বায়তুল মুকাদ্দাসকে খৃস্টানদের কবল থেকে মুক্ত করার শপথ নিয়ে জিহাদে নেমেছিলেন। তাঁর মনে দুর্মর স্বপ্ন, মসজিদুল আকসায় দু'রাকাত নামাজ পড়া।

খৃস্টানরা তাঁর জিহাদের মোকাবেলায় ফিলিস্তিন ধরে রাখতে পারতো না। কিন্তু ফিলিস্তিন উদ্ধারের পথে মুসলমানরাই তার বাঁধা হয়ে দাঁড়ালো।

ফিলিস্তিনী স্বাধীনতাকামীরা বায়তুল মুকাদ্দাস মুক্ত করার জন্য মাথাচাড়া দিয়ে উঠলে সিরিয়ার মুসলমানরা তাদেরকে তোপের তলায় গুড়িয়ে দিয়েছিল। আজও একই ঘটনার পূনরাবৃত্তি ঘটছে। খৃস্টান সমর্থিত ইহুদীদের কবল থেকে বায়তুল মোকাদ্দাস মুক্ত করার জন্য জেহাদরত মুজাহিদরা মুসলিম বিশ্বের শাসকদের আনুকূল্য থেকে বঞ্চিত। পরাশক্তি আমেরিকার জুজুর ভয়ে কাঁপছে সব ভেড়ার দল। অথচ একদিনের জন্য যদি মুসলিম বিশ্ব এক হতে পারতো তবে পাল্টে যেতো পৃথিবীর চেহারা। বিশ্বের মুসলমানদের দুর্ভাগ্য, তারা এমন লোককে শাসক বানায়, যারা আল্লাহর চাইতে আমরিকাকেই ভয় করে বেশী।

১১৭৫ সালের মার্চ মাস। সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী পার্বত্য এলাকা 'আর রিস্তান' পর্বতমালার এক জায়গায় ক্যাম্প করে তাঁর সামরিক উপদেষ্টা ও কমাণ্ডারদের নিয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ কিভাবে কোথায় নেয়া যায় সে বিষয়ে পরামর্শ করছিলেন।

তিনি হলবের অবরোধ উঠিয়ে খৃস্টান সম্রাট রিমাণ্ডের মোকাবেলা করতে ছুটে এসেছিলেন এখানে। কিন্তু আইয়ুবীর সাথে যুদ্ধ না করেই কৌশলে সরে যায় রিমাণ্ড।

হলববাসীরা তাদের আমীরদের মিথ্যা প্রচারে বিশ্বাস করে সুলতান আইয়ুবীর বিরুদ্ধে চলে গিয়েছিল। রিমাণ্ড ফিরে যাওয়ায় সুলতান আইয়ুবী আবার হলব আক্রমণ করে গাদ্দারদের ঘাঁটি ভেঙ্গে দেয়ার পরিকল্পনা করছিলেন, এমন সময় মিশর থেকে সংবাদ আসে, তাঁর সেনাপতি আলকিন্দি খৃস্টান ও সুদানীদের সাহায্য নিয়ে গোপনে মিশর আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

এ খবর পেয়ে সুলতান নতুন অভিযানে বেরোনোর আগে মিশরের অবস্থা কোন দিকে যায় বুঝার চেষ্টা করছিলেন। ফলে আর রিস্তান থেকে সৈন্য চালনায় বিরত থাকেন তিনি।

সুলতান আইয়ুবীর ভাই সুলতান তকিউদ্দীন আলকিন্দিকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেছেন এবং আলকিন্দি আত্মহত্যা করেছে এ খবর তখনও সুলতানের কাছে এসে পৌঁছেনি। সে জন্য তিনি আর রিস্তান পবর্তমালায় তাঁর হেডকোয়ার্টারে

অস্থির ভাবে বসেছিলেন।
ইসলামের এ মহান খাদেম ও অনুসারী সব সময় চারদিকে বিপদ দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকতেন। কতিপয় মুসলিম শাসক ও আমীর তাঁর বিরুদ্ধে সামরিক জোট গঠন করে খৃষ্টানদের সহায়তায় তার বিরুদ্ধে ময়দানে নেমে এসেছিল।
তাদের তুলনায় সুলতান আইয়ুবীর সৈন্য সংখ্যা ছিল নিতান্তই কম। কিন্তু আল্লাহর ওপর ভরসা করে জেহাদী জযবা নিয়ে তিনি মোকাবেলা করছিলেন তাদের।
তিনি এমন সব দুঃসাহসিক ও অভাবিত পদক্ষেপ নিয়েছিলেন যা কারো ধারণা বা কল্পনায়ও আসেনি কোনদিন।
শত্রুদের ধারনা ছিল, এ পাহাড়ী এলাকায় এমন শীত ও ঠাণ্ডার মধ্যে যুদ্ধের কোন চিন্তাই তিনি করতে পারবেন না।
পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় তখন সাদা বরফের পুরো আস্তরণ। এই বরফের রাজ্যে যুদ্ধ করার মত শারীরিক ও মানসিক ট্রেনিং নিয়েই সুলতান আইয়ুবী ময়দানে নেমেছিলেন। আইয়ুবীর সৈন্যদের এমন দুঃসাহসিক পদক্ষেপ প্রতিপক্ষের সৈন্যদের মনে ভয়ের কাঁপন জাগিয়ে দিয়েছিল।
তাদের একটাই ভরসা, সংখ্যায় তারা অনেক বেশী। কিন্তু তারপরও তাদের মনে মাঝে মধ্যে ব্যর্থতার আশংকা জাগতো।
সুলতান আইয়ুবী আশংকা করছিলেন, সম্রাট রিমাণ্ড হয়ত রাস্তা পরিবর্তন করে অন্য কোন পথে ফিরে এসে আক্রমণ চালাতে পারে। আর রিমাণ্ড আশংকা করছিল, তিনি

রাজধানীতে নেই এ খবর পেয়ে সুলতান আইয়ুবী হয়তো তার রাজ্য আক্রমণ করে বসতে পারে।

রিমাণ্ড তার রাজ্যে ফিরে গিয়ে নিজের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করার দিকে মনযোগ দিল।

সুলতান আইয়ুবী যেভাবে তাকে তাড়িয়ে দেন তাতে তিনি সহজেই রিমাণ্ডের পিছু ধাওয়া করতে পারতেন। কিন্তু সৈন্য সংখ্যা কম থাকায় সামনে অগ্রসর হওয়া থেকে বিরত থাকেন আইয়ুবী। আরেকটি কারণ ছিল, মিশরে সেনাপতি আলকিন্দির বিদ্রোহ।

তিনি আশংকা করলেন, মিশরের অবস্থা যদি আরো খারাপ হয়ে যায় তবে তাকে মিশর ফিরে যেতে হতে পারে। এ রকম একটি আশংকা ও ভয় থাকায় তিনি রিমাণ্ডের পিছু ধাওয়া থেকে বিরত থাকেন।

তিনি ভয় পাচ্ছিলেন, যদি তাকে মিশরে ফিরে যেতে হয় তবে এখানকার মুসলমান গাদ্দার আমীররা আবার খৃস্টানদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তার বিরুদ্ধে নতুন করে শক্তি সঞ্চয়ের সুযোগ পেয়ে যাবে। এ অবস্থায় মিশর থেকে কি সংবাদ আসে তার ওপরই নির্ভর করছিল সবকিছু। তিনি তার সেনাপতি ও উপদেষ্টাদের সাথে মিশরের এ সমস্যা নিয়েই আলোচনা করছিলেন।

এ সময় প্রহরী এসে সংবাদ দিলো, 'কায়রো থেকে কাসেদ এসেছে।'

তিনি তাকে ভিতরে ডেকে নিতে পারতেন, বরং এটাই ছিল

স্বাভাবিক। কিন্তু মিশরের পরিস্থিতি নিয়ে তিনি এতটাই পেরেশান ছিলেন যে, খবর পেয়ে নিজেই ছুটে বেরিয়ে এলেন। কাসেদ দীর্ঘ সফরের ক্লান্তি ও অবসাদ নিয়ে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নেমে সুলতানের তাবুর দিকে এগিয়ে আসছিল, সুলতান আইয়ুবী দ্রুত তাবুর বাইরে এসে উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'ভাল সংবাদ নিয়ে এসেছো তো?'

'অতি উত্তম সংবাদ এনেছি মোহতারাম সুলতান!' কাসেদ মুহূর্তে ক্লান্তি ও অবসাদ ঝেড়ে স্বতঃস্ফূর্ত সতেজ কণ্ঠে বললো, 'আপনার ভাই মোহতারাম তকিউদ্দীন সুদানী বাহিনীকে আসোয়ানের পাহাড়ী অঞ্চলে এমন মার দিয়েছে যে, দীর্ঘ দিন সুদানের দিক থেকে আর কোন আশংকা ও ভয়ের কারণ নেই। আলকিন্দি আত্মহত্যা করেছে।'

সুলতান আইয়ুবী দুই হাত আকাশের পানে তুলে ধরে চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জানালেন। বললেন, 'হে পরোয়ারদিগার! তোমার দ্বীনের এ মুজাহিদদের একমাত্র মুহাফিজ তুমি। তোমার হাতেই কল্যাণ ও বিজয়ের চাবিকাঠি। আমাদেরকে তোমার দ্বীনের জন্য কবুল করো। যেসব মুজাহিদ তোমার দ্বীনের পতাকা বুলন্দ করতে গিয়ে শাহাদাতের পেয়ালা পান করেছে, তাদের শাহাদাতকে কবুল করো তুমি।'

তাবু থেকে সুলতানের পেছন পেছন বেরিয়ে এসেছিলো সুলতানের উপদেষ্টা ও অফিসাররা। সুলতানের সাথে তারাও হাত তুললেন এবং 'আমীন' বলে আল্লাহর শোকরিয়া আদায়

করলেন।

এরপর কাসেদকে তিনি তাবুর মধ্যে নিয়ে গেলেন। সেখানেই তার জন্য নাস্তা-পানির ব্যবস্থা করা হলো। নাস্তা খেতে খেতে যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ দিচ্ছিল সে।

সুলতান জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের সৈন্যের হতাহতের সংখ্যা কত হবে?'

'তিনশ সাতাশ জন শহীদ হয়েছেন!' কাসেদ উত্তর দিল, 'পাঁচ শ'রও বেশী আহত। শত্রুদের সমস্ত সামরিক অস্ত্রশস্ত্র আমাদের হাতে এসেছে। সুদানী কমাণ্ডার ও খৃস্টান উপদেষ্টা ছাড়াও এক হাজার দু'শ দশজন হাবশী সৈন্য যুদ্ধবন্দী হয়েছে।'

এরপর কাসেদ সুলতানের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'মুহতারাম তকি জানতে চেয়েছেন, যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে আপনার আদেশ কি?'

'খৃস্টান উপদেষ্টা ও সুদানী সেনাপতিদের কয়েদখানায় রাখো। আর হাবশী বন্দীদের আসোয়ান পার্বত্য অঞ্চলে নিয়ে যাও। আসোয়ানের পাহাড়ে যেখানে যত লুকানোর স্থান আছে, সেসব কামরা ও গুহা পাথর দিয়ে ভরাট করাও। পাহাড় কেটে ফেরাউনরা যেসব মাটির মহল বানিয়েছিল, সেগুলোও ভরিয়ে দাও পাথর দিয়ে।

এসব কাজে ব্যবহার করো হাবশী বন্দীদের। যদি কোথাও পাহাড় কাটা বা খোদাই করার প্রয়োজন হয়, সে কাজও হাবশীদের দিয়ে করিয়ে নাও, যাতে পাহাড়ে কোন গহবর ও

ভিতরে কোন মহল না থাকে।
তকিউদ্দীনকে বলবে, কয়েদীদের সাথে যেন মানবিক ব্যবহার করে। যে যতটুকু কাজ করতে সক্ষম, তাকে ঠিক ততটুকু কাজে খাটাবে। কোন বন্দী যেন ক্ষুধার্ত ও পিপাসায় না থাকে। ওরা বন্দী, শুধু এ জন্যই ওদের সাথে কর্কশ আচরণ ও মন্দ ব্যবহার করবে না।
আসোয়ান পাহাড়ের পাদদেশে তাবু টানিয়ে উন্মুক্ত বন্দীখানা বানিয়ে নাও। ওদের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করো সেখানে। আর যদি সুদানীরা যুদ্ধবন্দী ফেরত চায় তবে আমাকে জানাবে। আমি নিজেই ওদের সাথে বিনিময় মূল্য ও শর্ত নির্ধারণ করবো।'
এরপর সুলতান কাসেদকে বললেন, 'তকিউদ্দীনকে বলবে, আমার বিশেষ সেনা সাহায্য প্রয়োজন। এ জন্য নতুন সৈন্য ভর্তির কাজ দ্রুত ও জোরদার করতে বলবে। সামরিক ট্রেনিং পুরোদমে চালিয়ে যাবে। চারদিকে গোয়েন্দাদের জাল বিছিয়ে রাখতে বলবে আলীকে।
আলকিন্দির মত যোগ্য ও বিশ্বাসী সেনাপতি যদি বিশ্বাসঘাতক হতে পারে, তবে যে কেউ, যে কোন সময় গাদ্দার হয়ে যেতে পারে। শয়তান বসে নেই। আমাকেও গাদ্দার বানানোর জন্য সে সব সময় চেষ্টা করবে। তাই সব সময় সতর্ক থাকতে হবে আমাদের। কারো উপরই ভরসা করে চোখ কান বন্ধ রাখা যাবে না। এ ব্যাপারে আলী বিন সুফিয়ানকে আরো সতর্ক ও সাবধান থাকতে বলবে।'

'মিশর থেকে সৈন্য সাহায্য না আসা পর্যন্ত কোন বিরাট ঝুঁকি না নেয়াই উত্তম হবে।' সুলতান আইয়ুবী কাসেদকে ফেরৎ পাঠানোর পর তাঁর সেনাপতিদের বললেন, 'এখন পর্যন্ত আমরা যে সফলতা পেয়েছি তার প্রতিরক্ষার দিকে নজর দেয়া দরকার। বর্তমানে তোমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু তোমাদের ভাই। হলবে আল মালেকুস সালেহ তোমাদের গর্দান কাটার জন্য বসে আছে। হারান কেল্লার গুমাস্তগীন সৈন্য প্রস্তুত রেখেছে তোমাদের জন্য। মুশালের সাইফুদ্দিন তোমাদের বিরোধী। এই তিন শক্তি এক হয়ে যদি আমাদের বিরুদ্ধে ময়দানে নামে, আমাদের পক্ষে তাদের মোকাবেলা করা কঠিন হয়ে যাবে।

রাজা রিমাণ্ডকে আমরা পিছু হটিয়ে দিয়েছি, কিন্তু সে তো এই অপেক্ষায়ই বসে আছে, মুসলমানরা নিজেদের মধ্যে বিবাদ করে শক্তি ক্ষয় করুক, তারপর সে ওখান থেকে ফায়দা লুটবে।'

'আল মালেকুল সালেহ, সাইফুদ্দিন ও গুমাস্তগীনকে ইসলামের সঠিক পথে ফিরিয়ে আনা যায় কিনা তার একটা চেষ্টা করলে কেমন হয়?' এক সেনাপতি বললো।

'না।' সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'যেসব ব্যক্তি তাদের মন মগজ ও বিবেক সত্য থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন ও বিমুখ করে নিয়েছে, আল্লাহর গজব ও শাস্তি ছাড়া তাদের ভাগ্যে আর কিছু নেই। আমি কি এ বিষয়ে চেষ্টা করিনি? তার উত্তরে

তারা আমাকে হুমকি দিয়েছে। আবার যদি আপোষের জন্য দূত পাঠাই, তবে তারা ভাববে ও বলবে, সালাহউদ্দিন এখন যুদ্ধ করতে ভয় পাচ্ছে।

আমি ওদের আর এমন অভিযোগ করার সুযোগ দেবো না। আমি এখন ওদের উপরে আল্লাহর গজব ও অভিশাপ হয়ে আঘাত হানতে চাই। আর আল্লাহর সে গজব হচ্ছো তোমরা ও তোমাদের দুর্ধর্ষ সৈন্যদল।'

তিনি আফসোস করে বললেন, 'তোমরা তো হলব অবরোধ করেছিলে, দেখেছ হলবের মুসলমান কেমন বীরের মত লড়েছিল? তোমরা কি সে কথা ভুলতে পারবে? তারা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে কিন্তু তাদের মনোবল দেখে প্রশংসা না করে পারি না। এমন জানকবুল করে যুদ্ধ শুধু মুসলমান জাতিই করতে জানে। হায়, যদি এই শক্তি ইসলামের জন্য ব্যয় হতো তবে কতই না কল্যাণ হতো!

তোমরা জানো, আমি রাজ্য বিস্তারের জন্য যুদ্ধ করছি না, আমার উদ্দেশ্য শুধু মুসলিম বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ করা। বিচ্ছিন্ন মুসলিম শক্তিকে সংহত করে ফিলিস্তিন মুক্ত করা। আমি মুসলিম বিশ্বের সম্প্রসারণ চাই, বিস্তৃতি চাই।'

'আমরা এ ব্যাপারে নিরাশ নই।' এক সেনাপতি বললো, 'নতুন রিক্রুট চলছে। দামেশকের যুবকরাও দলে দলে ভর্তি হচ্ছে ফৌজে। মিশর থেকেও সেনা সাহায্য আসছে। ওদের নিয়ে আমরা আপনার প্রতিটি আশা পুরণ করবো ইনশাল্লাহ।'

'কিন্তু আমি আর কতদিন দুনিয়ায় বেঁচে থাকবো!' সুলতান

আইয়ুবী বললেন, 'আর তোমরাই বা কতদিন বাঁচবে? তুমি যে নতুন রিক্রুটের কথা বলছো এটা অবশ্যই আশার কথা। কিন্তু দূরদর্শিতা ভিন্ন জিনিস। তোমাকে কেবল নিজের শক্তির দিকে তাকালেই চলবে না, দেখতে হবে প্রতিপক্ষের শক্তিও।

শয়তানের দলও বড় হচ্ছে, তাদেরও পরিধি বাড়ছে। আমার সেই প্রিয় বন্ধু, যার ওপর আমার এত বিশ্বাস ও ভরসা ছিল, শেষে সেও খৃস্টানদের যাদুর ফাঁদে পা দিয়ে শেষ হয়ে গেল! তোমরা তো জানো, আলকিন্দি তোমাদের কত বিশ্বস্ত বন্ধু ছিল। সেই আলকিন্দি সুদান থেকে হাবশী সৈন্য এনে গোপনে মিশর জয় করে নিজেই তার শাসনকর্তা হতে চাইবে, এটা কি কোনদিন তোমরা ভাবতে পেরেছিলে!

সে আমাকে এটুকু দয়া করেছে, যুদ্ধে পরাজিত হয়ে নিজেকে নিজেই শেষ করে প্রায়শ্চিত্য করেছে। তাকে মৃত্যদণ্ড দেয়ার কষ্ট আমাকে করতে হয়নি। কিন্তু তার এই করুণ পরিণতি আমাদের হৃদয়গুলোকে কি ক্ষত-বিক্ষত করেনি!

নেতৃত্ব ও ক্ষমতার নেশা খুবই ভয়ংকর ও মারাত্মক নেশা। এ নেশা, প্রতিপত্তি ও ধনের নেশা বা নারী এবং মদের নেশার চেয়েও ভয়ংকর। বহু ভাল ভাল লোক কখন যে এ নেশায় পড়ে অন্ধ হয়ে গেছে, টেরও পায়নি।

বলতে পারো, ঈমানের ধন হারিয়ে গেলে মুমীন জীবনের আর কি মূল্য থাকে? ঈমান তো আর সোনা রূপা নয় যে, বিক্রি করা যাবে! মেয়ে মানুষ নয় যে, ভোগ করা যাবে! ঈমান তো আত্মার সম্পদ! একবার যদি হৃদয়ের দরোজা বন্ধ করো,

ঈমান বেকার বস্তুতে পরিণত হবে। বিবেককে ঢেকে দেবে কালো পর্দার আবরণ।

যে বীর মুজাহিদরা সমুদ্র পাড়ি দিয়ে নিজেদের জাহাজগুলো নিজ হাতে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছিল, কল্পনা করো তাদের ঈমানের জোর! ঈমান কি অমূল্য সম্পদ তাদের কাছ থেকেই তা আমাদের শিখতে হবে। তারাই জানে ঈমানের মূল্য কি? বিজয় বা শাহাদাত ছাড়া বিকল্প কোন পথ ছিল না তাদের সামনে। পরাজিত হয়ে ফিরে যাওয়ার কোন ধারনা তাদের মনে স্থান পায়নি।

অস্ত্রের জোরে নয়, ঈমানের জোরে তারা স্পেন জয় করেছিল। তাদের বিদেহী আত্মা আজো দুনিয়ার পথে প্রান্তরে ঘুরে ঘুরে চিৎকার করে বলছে, যে হৃদয়ে পলায়নী মনোবৃত্তি ও আপোষকামীতা থাকে সে হৃদয় ঈমানদার নয়। ঈমানদার সেই, যে লোক ভয়শূন্য ও বিচক্ষণ।

মুসলমানদের শিথিলতার সুযোগে ব্যর্থ হয়ে যায় শত শত শহীদের রক্তদান। আল্লাহর দরবারে শহীদরা বিজয়ী বীরের মর্যাদা পায় ঠিকই, কিন্তু যাদের সুখ শান্তির জন্য জীবন দেয় ওরা, তাদের জীবনে নেমে আসবে দুর্ভোগ ও জিল্লতি।'

অফিসাররা অভিভুত হয়ে শুনছিল সুলতানের কথা।

তিনি খানিক বিরতি দিলেন। তারপর আবার বলতে শুরু করলেন, 'কোন জাতি যদি তার শহীদদের ভুলে যায়, আল্লাহ যাদেরকে মৃত নয় বলে ঘোষণা করেছেন, তাদেরকে হারিয়ে ফেলে আপন স্মৃতি থেকে, সে জাতির পতন অনিবার্য।

আরো শুনে রাখো, জেহাদের জন্য পরীক্ষিত ও প্রাণপাতকারী মুজাহিদদের পরিবর্তে যদি সুবিধাবাদী লোকেরা কোন কাফেলার নেতৃত্বে আসে, তাদের পতনও কেউ রোধ করতে পারে না।

জেহাদের পথ বেয়ে আমাদের খলিফা ও আমীররা ক্ষমতা লাভ করেনি। তারা ক্ষমতা পেয়েছে উত্তরাধিকার সূত্রে। ফলে দেশ ও জাতির জন্য তাদের সেই মায়া নেই, যে মায়া থাকলে জাতির জন্য ওরা অকাতরে নিজের রক্ত বিলিয়ে দিতে পারতো।

এক ফোটা রক্তও না বিলিয়ে দেশের কর্তৃত্ব পাওয়ায় ওরা স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের মূল্য বুঝে না। বিনামূল্যে ক্ষমতা পেয়েছে বলে দেশের জন্য কোন দরদ নেই এদের।

এ জন্যই কঠিন দায়িত্ব কাঁধে নিয়েও ওরা বিলাসিতা ও সুখের সাগরে হাবুডুবু খেতে পারে। ক্ষমতা ও গদির জন্য নিজের ঈমান বিক্রি করে দিতে পারে। জাতির প্রতি নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিদের কণ্ঠ রুদ্ধ করার পায়তারা করতে পারে।'

সুলতান বলছিলেন, 'আমাদের প্রিয় নবী (সা.) ও তার প্রিয় সাহাবীরা শরীরের ঘাম ও রক্ত ঝরিয়ে অর্ধ পৃথিবীতে ইসলামের আলো জ্বেলেছিলেন। তাদের উত্তরসূরীরা সেই আলো বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়েছিলেন অসীম ত্যাগ ও কোরবানীর বিনিময়ে। কিন্তু আজ? আজ শয়তান আবার আল্লাহর বান্দাদের ঘাড়ে সওয়ার হয়েছে। অন্যায় ও অসত্যের ফেতনা আবার ছোবল হানতে শুরু করেছে মুসলমানদের মন মগজে।

সেই ফেতনার কারণেই আমরা আজ পরস্পরের রক্ত ঝরাতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি।'

সুলতান আবার একটু থামলেন। এই ফাঁকে এক উপদেষ্টা বললো, 'কাফেরদের আগে গাদ্দারদের নির্মূল করা প্রয়োজন। যদি আমরা সত্যের ওপর থেকে থাকি তবে আল্লাহ আমাদের অবশ্যই বিজয় দান করবেন। যেহেতু আমাদের চেতনায় সত্য ও সততার আগুন আছে, তাই আমরা ব্যর্থ হবো না, হতে পারি না।'

'তুমি ঠিকই বলেছো।' সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'এ অঞ্চলের শাসন ক্ষমতা খৃস্টানদের হাতেই থাকুক, আর নামধারী মুসলমানদের হাতেই থাকুক, জনগণের ভাগ্যের তাতে কোন পরিবর্তন হবে না। জুলুম, নির্যাতন আর সন্ত্রাসের রক্ত-নদীতেই ডুবে থাকতে হবে তাদের। খৃস্টানদের আধিপত্য কবুলকারী গাদ্দার মুসলিম শাসকেরা খৃস্টানদের মতই মজলুম জনতার ওপর শোষণের স্টীমরোলার চালাবে।'

আইয়ুবী ঠিকই বলেছিলেন। পরবর্তীতে ইতিহাসে আমরা তার অসংখ্য নজীর দেখেছি। স্পেনে মুসলমানদের পতন হলো কেন? হয়তো অনেকেই বলবে, কাফেরদের ষড়যন্ত্রের কারণে। কিন্তু তাদের ষড়যন্ত্র সফল হলো কিভাবে? সফল হলো, মুসলমানরা নিজেরাই কাফেরদের ষড়যন্ত্রের বস্তু ও অস্ত্রে পরিণত হয়েছিল বলে। মুসলমানরা তাদের দোসর হিসাবে কাজ না করলে, গাদ্দারীর মূল্য ও পুরস্কার না নিলে, স্পেনে

মুসলমানদের পতন হতো না।
জিন্দাদীল ঈমানদার শহীদদের রক্তের বিনিময়ে স্পেনে যে ইসলামের বিজয় নিশান উড়েছিল, সেই নিশান ধুলায় লুটিয়ে পড়েছিল আবু আবদুল্লাহর মত গাদ্দারদের কারণে।
কাফের ও খৃস্টানরা মুসলিম আমীরদেরকে ধন সম্পদ ও ইউরোপের সেরা সুন্দরীদের ভেট দিয়ে তাদেরকে হস্তগত করেছিল। তাদের প্ররোচনায় তারা নিজের সেনাবাহিনীকেও অপ্রয়োজনীয় মনে করেছিল।
দেশের জনগণ ও ঈমানের আলোয় আলোকিত মুজাহিদরা যখন এই আত্মঘাতি পদক্ষেপের বিরোধিতা করলো, তখন সেই বিলাসপ্রিয় নেতারা তাদেরকেই অপরাধী সাব্যস্ত করেছিল। এভাবেই খৃস্টানরা মুসলমানকে দিয়ে ইসলামের পতাকাবাহী কাফেলাকে স্তব্ধ করে দিয়ে পরে সেই গাদ্দার নেতৃবৃন্দ ও চেতনাহীন মুসলমানদেরকে স্পেনের মাটি থেকে উচ্ছেদ করে তাদের রক্ত ধোয়া মাটিতে খৃস্টান সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে।

সুলতান আইয়ুবী ঈমানী চেতনাদীপ্ত এক মুজাহিদই ছিলেন না, তিনি ছিলেন অসম্ভব প্রতিভাধর এক সমর বিশারদও। তিনি তার সেনাবাহিনীকে এমনভাবে বিন্যস্ত করে রেখেছিলেন, তার দখলকৃত কোন কেল্লাতে শত্রুরা আক্রমণ করার কথা চিন্তাও করতে পারছিল না।
আইয়ুবীর অগ্রযাত্রা প্রতিহত করতে প্রতিপক্ষ যেমন প্রতিরোধ

গড়ে তুলছিল নিজেদের শক্তি ও ক্ষমতানুযায়ী, তেমনি তৎপর ছিলেন সুলতান আইয়ুবীও। কেল্লাতে তিনি অল্প সংখ্যক সৈন্যই মোতায়েন রাখলেন। কারণ তিনি কেল্লার মধ্যে থেকে যুদ্ধ করার পক্ষপাতি ছিলেন না। এর পরিবর্তে পাহাড়ী এলাকার সমস্ত রাস্তায় ও প্রান্তরে এবং পবর্ত চূড়ায় তীরন্দাজদের তিনি বসিয়ে রেখেছিলেন।
যে সব রাস্তা সরু তার পাশে পাহাড় চূড়ায় ভারী পাথর জমিয়ে লোক বসিয়ে রেখেছিলেন, শত্রুরা কাছে এলে তাদের ওপর যেন সে পাথর গড়িয়ে দেয়া যায়। দামেশকসহ বিভিন্ন পথে কমাণ্ডো সৈন্যদের বসিয়ে রেখেছিলেন শত্রুর যে কোন হামলা মোকাবেলার জন্য।

হিম্মাতের সর্বোচ্চ এবং প্রশস্ত শৃঙ্গটি ছিল টিলার মত। টিলার চূড়াটি শিংয়ের মত দু'দিকে বিভক্ত হয়ে গেছে। সেটাকে সুলতান আইয়ুবী একটি ফাঁদ বানালেন। সেনাপতিদের বুঝিয়ে দিলেন, শত্রু বাইরে থেকে যুদ্ধ শুরু করলে কিভাবে এ ফাঁদ ব্যবহার করে শত্রুদের শায়েস্তা করতে হবে।
সুলতান আইয়ুবী সমগ্র এলাকা এমনভাবে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিলেন, শত্রুদেরকে ইচ্ছে মত তিনি যে কোন দিকে হাকিয়ে নিতে পারেন। এছাড়া তিনি কমাণ্ডো বাহিনীকে ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে দূর দূরান্তে টহলে পাঠিয়ে দিলেন।
অন্যদিকে সুলতানের গোয়েন্দা বিভাগও ছিল সমান সক্রিয়। সমগ্র এলাকায় যেমন গোয়েন্দারা ছড়িয়েছিল, তেমনি সক্রিয়

ছিল শত্রুদের কেল্লার মধ্যেও। তারা দুশমনের প্রতিটি গতিবিধির সংবাদ তাৎক্ষণিকভাবে সুলতানকে পাঠানোর ব্যবস্থা করে রেখেছিল।

গোয়েন্দা মারফত তিনি জানতে পেরেছিলেন, তথাকথিত খলিফা আল মালেকুস সালেহ তাঁর গভর্ণর হারান কেল্লার অধিপতি গুমাস্তগীন ও মুশালের শাসক সাইফুদ্দিনকে সাহায্যের জন্য ডেকে পাঠিয়েছেন।

জানা গেছে, তারা উভয়েই কিছু শর্ত আরোপ করে সাহায্য দিতে রাজী হয়েছে। এসব শর্ত না মানলে তারা খলিফার ডাকে সাড়া দেবে না।

গোয়েন্দা এ কথাও জানিয়েছে, এসব মুসলমান শাসক ও আমীর প্রকাশ্যে ঐক্যবদ্ধ থাকলেও তাদের অন্তরে পরস্পরের বিরুদ্ধে রয়েছে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব। প্রত্যেকেই যুদ্ধ করে নিজের রাজ্য ও এলাকা বাড়ানোর চেষ্টায় আছে।

আর খৃস্টানরা তাদেরকে সাহায্য দেয়ার চেয়ে উৎসাহ দিয়েই দায়িত্ব শেষ করতে চায়। বিশেষ করে খৃস্টানদের আগ্রহ হচ্ছে, যে করেই হোক, মুসলমানরা যেন একে অন্যের সাথে সংঘাতে লিপ্ত হয়ে যায়।

'শামস বখত ও সাদ বখতের কোন সংবাদ এখনও আসেনি?' হাসান বিন আবদুল্লাহকে জিজ্ঞেস করলেন সুলতান।

'নতুন কোন খবর নেই।' হাসান বিন আব্দুল্লাহ উত্তর দিলেন, 'তারা খুব সাফল্যের সাথেই কাজ করছে। গুমাস্তগীন কোন

এ্যাকশনে গেলে এ দুই সেনাপতিই সামাল দিতে পারবে বলে আমি মনে করি। তাদেরকে সেভাবেই কাজ করতে বলা হয়েছে।'

আলী বিন সুফিয়ানের সহকারী হাসান বিন আবদুল্লাহ সুলতান আইয়ুবীর বর্তমান অভিযানে গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। আলী বিন সুফিয়ানকে সুলতান রেখে এসেছিলেন তাঁর অনুপস্থিতিতে বিশেষভাবে মিশরের নিরাপত্তার দিকে খেয়াল রাখার জন্য। মিশরের বাইরে দামেশক ও অধিকৃত অঞ্চলের দায়িত্ব ছিল হাসানের ওপর।

সুলতান আইয়ুবী হাসানের সাথে যে শামস বখত ও সাদ বখতকে নিয়ে আলাপ করছিলেন, ওরা দু'জনই ছিল গুমাস্তগীনের সেনাপতি।

গুমাস্তগীন সম্পর্কে তো আগেই বলা হয়েছে, লোকটা ছিল শয়তান প্রকৃতির। দায়িত্ব ও পদমর্যাদায় সে একাধারে প্রাদেশিক গভর্ণর ও হারান দুর্গের অধিপতি।

আইয়ুবীর অভিযানের খবর পেয়েই সে কেল্লার সৈন্যদের সংহত করে কেল্লার ভেতরে ও বাইরে প্রচুর সৈন্য সমাবেশ ঘটালো। খেলাফতের অধীন এবং খলিফার আদেশের বাধ্য ও অনুগত হওয়ার পরও সে তার নিজস্ব রাজনীতি এতটাই সক্রিয় ছিল যে, রাজনীতিতে তার মত ধুরন্ধর ও দক্ষ সেখানে আর কেউ ছিল না।

চতুর রাজনীতিবিদ হিসাবে সে এতটাই মশহুর ছিল যে, স্বয়ং খলিফাও তাকে ঘাটাতে সাহস পেতো না। খলিফার

অনুমোদন ছাড়াই সে এমন সব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিত, স্বাভাবিকভাবে যা কোন গভর্ণর বা কেল্লা প্রধান নিতে পারে না।

সে গোপনে খৃস্টানদের সাথে আলাদভাবে মৈত্রী চুক্তি করে রেখেছিলো। এ মৈত্রী চুক্তির পিছনে ছিল এক বিরাট ইতিহাস। ভাগ্যের বিরল সহায়তা ছিল এ চুক্তির পেছনে।

মরহুম নুরুদ্দিন জঙ্গীর যুদ্ধবন্দী খৃস্টানদের মধ্যে ছিলেন রাজা রিজনেল্ট। নুরুদ্দিন জঙ্গীর ওফাতের সময় রাজা রিজনেল্ট বন্দী ছিলেন তার কেল্লায়। সুলতান নুরুদ্দিন জঙ্গীর মৃত্যুর পর গুমাস্তগীন খৃস্টানদের সাথে বন্ধুত্ব করার আশায় কারো আদেশ ও পরামর্শ ছাড়াই গোপনে সমস্ত খৃস্টান কয়েদীদের মুক্ত করে দেয়। বিনিময়ে তাদের কাছে দাবী করে শুধু বন্ধুত্ব। বন্দী মুক্তির বিনিময়ে সে মুক্তিপন আদায় করতে পারতো এবং খৃস্টানরা খুশী মনেই তা দিতে রাজীও হতো। কিন্তু সে টাকা-কড়ি, সোনা-দানা কিছুই না নিয়ে কেবল তাদের বন্ধুত্বের দাবী জানায়। তার এ আচরণে সম্রাট রিজনেল্ট এবং অন্যান্য বন্দী খৃস্টানরা সন্তুষ্ট হয়ে অঙ্গীকার করে, আইয়ুবীর মোকাবেলায় যখন তার সাহায্য দরকার হবে তখন তারা তাকে সর্বোতভাবে সহযোগিতা করবে। এ আশ্বাসটুকুই ছিল তার বড় চাওয়া-পাওয়া।

তার দুই সেনাপতি বুদ্ধি, যোগ্যতা ও রণকৌশলে খুবই পারদর্শী। গুমাস্তগীন তাদের খুব বিশ্বাস করতো। এরা ছিল দুই আপন ভাই। একজনের নাম শামস বখত, অন্য জনের

নাম সাদ বখত। এরা ছিল ভারতীয় মুসলমান।

ঐতিহাসিক কামালুদ্দিন তার আরবী গ্রন্থ 'তারিখুল হলব'-এ এদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'এরা দু'জন একই মায়ের সন্তান ছিল। নুরুদ্দিন জঙ্গীর শাসনকালে ভারত থেকে ওরা বাগদাদ আসে। জঙ্গী তাদের যোগ্যতা ও ঈমানদারী দেখে সেনাবাহিনীর উচ্চ পদে নিয়োগ করেন। জঙ্গীর মৃত্যুর সময় ওরা হারান দুর্গে ছিলেন।'

কাজী বাহাউদ্দিন শাদ্দাদও তার ডাইরীতে এদের নাম উল্লেখ করেছেন।

আরবী ভাষায় কারো নামের সাথে পিতার নাম উল্লেখ থাকে। সে জন্য এ দুই ভাইয়ের নাম এভাবে উল্লেখ আছে, শামস বখত ইবনে রেজা ও সাদ বখত ইবনে রেজা। কিন্তু রেজা কে ছিলেন তার কোন উল্লেখ কোন ইতিহাসে নেই।

ইতিহাসে এদের দু'জনের নাম উল্লেখ করার কারণ একটি বিশেষ ঘটনা। চাঞ্চল্যকর এ ঘটনাটি ছিল সমসাময়িক ইতিহাসে খুবই উল্লেখযোগ্য ও তাৎপর্যময়। এ সুবাদেই তারা ইতিহাসের অংশ হয়ে গেল।

ঘটনাটা হচ্ছে, হারানে কার্যত স্বৈরাচারী শাসক গুমাস্তগীন শাসনই চলতো। সে তার এক তোষামোদী ও কুকর্মের দোসর ইবনুল খাশিব আবুল ফজলকে হারানের প্রধান বিচারকের পদে নিয়োগ করে।

ইসলামে বিচারক তিনিই হতে পারেন, যিনি বিচক্ষণ, দুরদর্শী

ও ন্যায়বিচারের সাহস ও যোগ্যতা রাখেন। কিন্তু আবুল ফজল গুমাস্তগীনের সব অন্যায় অবিচারের দোসর ও তোষামদকারী হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

বিচারের নামে তার অবিচারের অসংখ্য কাহিনী সেনাপতি শামস বখত ও সাদ বখত জানতো। কিন্তু তারা সামরিক বিভাগের লোক বলে উভয়েই এ ব্যাপারে নীরব থাকে।

বিচার বিভাগ তাদের এখতিয়ারভুক্ত নয় বলে এসব অবিচারের বিরুদ্ধে তাদের করার কিছু ছিল না। স্বভাবতই তারা তার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল, কিন্তু এ ব্যাপারে মুখ ফুটে কখনোই কিছু বলেনি।

গুমাস্তগীনের ওপর এ কাজীর যেমন প্রভাব ছিল, তেমনি প্রভাব ছিল এ দুই সেনাপতির। কারণ তাদের যোগ্যতা ও ব্যক্তিত্বই ছিল প্রভাব বিস্তারকারী।

সুলতান আইয়ুবী নুরুদ্দিন জঙ্গীর মৃত্যুর পর যখন মাত্র সাতশ অশ্বারোহী নিয়ে মিশরের সাথে সিরিয়াকে একীভূত করলেন, তখনই তিনি সিরিয়ার বিভিন্ন রাজ্য ও পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে তার ঝানু গোয়েন্দাদেরকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। জঙ্গীর মৃত্যুর সময় পর্যন্ত যেসব দেশ ইসলামী খেলাফতের অধীনে ছিল, তাদের অনেকেই তার মৃত্যুর পর নিজেদেরকে স্বাধীন সুলতান হিসেবে ঘোষণা দিয়ে বসে। গুমাস্তগীন কার্যত স্বাধীনতা ঘোষণা না করলেও কার্যত স্বাধীনভাবেই শাসন কার্য নির্বাহ করছিল।

সুলতান আইয়ুবী যখন আর রিস্তানের পাহাড় চূড়ায়, তখনকার

ঘটনা। এ সময় আইয়ুবীর এক তুর্কী গোয়েন্দা আনতানুস হারানে গিয়ে পৌঁছে। সে খুবই সুশ্রী ও সুন্দর চেহারার যুবক ছিল। তুর্কী ভাষা ছাড়াও সে ভাল আরবী বলতে পারতো।
সে গুমাস্তগীনের কাছে গিয়ে তার জীবনের এক করুণ কাহিনী তুলে ধরলো। সে গুমাস্তগীনকে বললো, তার পরিবার পরিজন ও বংশের লোকেরা সবাই জেরুজালেম বাস করতো। জেরুজালেম তখন খৃস্টানদের অধিকারে। খৃস্টানরা মুসলমানদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার উৎপীড়ন শুরু করছিল। যাকে ইচ্ছা ধরে নিয়ে গিয়ে বেগার খাটাচ্ছিল।
সে বললো, 'আমার দুটি বোন ছিল অসাধারণ সুন্দরী। একদিন খৃস্টানরা আমার দুই বোনকেই এক সাথে তুলে নিয়ে গেল।
আমি তখন বাড়ী ছিলাম না। বাড়ী এসে দেখতে পাই, আমার ভাই এবং বাবাকেও ওরা ধরে নিয়ে গেছে বেগার খাটাতে। যখন বুঝলাম, ধরতে পারলে আমাকেও ওরা বেগার ক্যাম্পে নিয়ে যাবে, তখন আমি দেশ থেকে পালিয়ে আসে।
এখন আমার কোন আশ্রয় নেই, ঠিকানা নেই, বাঁচার মত কোন সঙ্গতিও নেই। এখন আমার একটি কাজ দরকার।'
গুমাস্তগীনকে সে আরো বললো, 'আমার পরিবারের ওপর যে অত্যাচার করা হয়েছে আমি তার প্রতিশোধ নিতে চাই। আমি সেনাবাহিনীতে ভর্তি হতে চাই।'

তার অবস্থা এমন করুণ দেখাচ্ছিল, দেখে মনে হচ্ছিল,

জেরুজালেম থেকে সে পায়ে হেঁটে এত দূর চলে এসেছে। ক্ষুধা ও ক্লান্তিতে তাকে আধ মরা দেখাচ্ছিল।

গুমাস্তগীন গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলো এই যুবককে। ক্লান্তি ও অবসন্নতার মাঝেও তার সুগঠিত শরীর ও প্রশস্ত বুক বলছিল, সৈনিক হিসাবে এ যুবক খুবই চৌকস হবে।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'ঘোড়সওয়ারী ও তীরান্দাজীতে কোন অভিজ্ঞতা আছে তোমার?'

'এখন আমার একটু বিশ্রাম ও খাওয়া প্রয়োজন।' ক্লান্ত কণ্ঠে বললো সে, 'ঘুম থেকে উঠে আমি ইনশাআল্লাহ আপনার সব প্রশ্নেরই সন্তোষজনক জবাব দিতে পারবো আশা করি।'

গুমাস্তগীন এক প্রহরীকে ডেকে তার খাওয়া দাওয়া ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করতে বললো।

খাওয়া দাওয়ার পর দীর্ঘ এক ঘুম থেকে যখন সে উঠলো, তার চেহারায় ক্লান্তি ও অবসাদের কোন চিহ্ন ছিল না।

পরদিন গুমাস্তগীন দরবার শেষে তাকে নিয়ে প্যারেড গ্রাউণ্ডে গেল। সেখানে আগে থেকেই ঘোড়া ও তীর ধনুক নিয়ে অপেক্ষা করছিল গুমাস্তগীনের এক বডিগার্ড।

তিনি ওখান থেকে একটা তীর নিয়ে বললেন, 'এই নাও, এটা দিয়ে তুমি তোমার পছন্দ মত যে কোন একটা লক্ষ্যভেদ করো।'

সে তীর হাতে নিয়ে দেখলো, পাশের একটি গাছের ওপর ছোট্ট এক চড়ুই পাখি বসে আছে। সে সেই পাখিকে নিশানা

করলো। তীরটি পাখিকে নিয়ে গাছ থেকে একটু দূরে মাটিতে গিয়ে পড়লো।

সে আরও একটি তীর চাইলো। তীরটি নিয়ে সে অশ্বপৃষ্ঠে উঠলো। বললো, 'ঘোড়া ছুটিয়ে আমি যখন কাছে আসবো তখন কোন জিনিষ শূন্যে ছুঁড়ে দেবেন।'

ঘোড়া নিয়ে ময়দানে ছুটে গেল যুবক। গুমাস্তগীনের বডিগার্ড দৌড়ে গিয়ে একটি খাবার প্লেট নিয়ে এলো, প্লেটটা ছিল চীনামাটির।

আনতানুস ঘোড়া নিয়ে দূরে গেল। সেখান থেকে তীর বেগে ছুটে আসছিল ঘোড়া, আনতানুস ধনুকে তীর জুড়লো। বডিগার্ড প্লেটটি শূন্যে ছুঁড়ে দিলে আনতানুস ছুটন্ত অশ্ব থেকে তীর বর্ষণ করলো। প্লেটটি শূন্যে খান খান হয়ে ভেঙ্গে ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে।

কেউ জানতো না, আনতানুস একজন সুদক্ষ গোয়েন্দা ও দুধর্ষ কমাণ্ডো। প্রতিটি যুদ্ধাস্ত্রের ব্যবহারে যেমন সে পারদর্শী তেমনি উস্তাদ অশ্ব চালনায়। তার সুগঠিত দেহ, বলিষ্ঠ শরীর, আকর্ষণীয় চেহারা, ফর্সা গায়ের রং ও চমৎকার নৈপুন্য দেখে গুমাস্তগীন খুব আকৃষ্ট হলো। সাধারণ সৈন্যদের সাথে না দিয়ে গুমাস্তগীন তাকে তার নিজের বডিগার্ডের দলে নিয়ে নিল।

দু'জন করে বডিগার্ড গুমাস্তগীনের মহলের দরজায় পালা করে ডিউটি দিত। কিছুদিনের মধ্যেই মহলে গার্ড দেয়ার ডিউটি পেল আনতানুস। সপ্তাহের সাত দিনই সেখানে তার ডিউটি থাকে।

মুসলিম আমীরদের রীতি অনুযায়ী গুমাস্তগীনের মহলেও চলতো সৌন্দর্যের লীলাখেলা। হারেমে ছিল বারো-চৌদ্দজন সুন্দরী।

আনতানুস প্রথম দিন গিয়েই মহলের চারদিক, মহলে প্রবেশের সব দরোজা, প্রতিটি কামরা ও কামরার কোথায় কি আছে দেখে নেয়। সে সেখানকার সমস্ত চাকর চাকরানী ও নারী পুরুষকে বলে, 'মহলের প্রতিরক্ষার জন্য আমাদের নিয়োগ করা হয়েছে, সে জন্য পুরো বাড়ীর কোথায় কি আছে সব খোঁজখবর ও বিষয় সম্পর্কে আমাদের জানা থাকা দরকার।'

সে যখন কামরাগুলো ঘুরে ঘুরে দেখছিল, এক যুবতীর সাথে দেখা হয়ে গেল তার। এ মেয়ে গুমাস্তগীনের নতুন এক বেগম, অন্দর মহলের শোভা বর্ধনকারীদের অন্যতম।

সে আনতানুসকে ডাটের সাথে জিজ্ঞেস করলো, 'কে তুমি, এখানে কি করছো?'

'আমি এখানকার নতুন গার্ড!' সে উত্তর দিল, 'দেখছি, এ মহলে কোন্ কোন্ পথে আসা যাওয়া করা যায়। আর এখানে যারা থাকে তাদেরও চিনে রাখা দরকার।'

'গার্ড তো এখানে আগেও ছিল, কেউ তো কোনদিন ভেতরে আসেনি!' মেয়েটি বললো, 'তোমার এভাবে মহলের ভেতর আসা ঠিক হয়নি।'

'এটা আমার দায়িত্ব। যদি অন্দর মহল থেকে কোন মেয়ে

নিখোঁজ হয়ে যায়, জবাবটা কে দেবে, তুমি না আমি? কেল্লার মালিক যদি সে সুন্দরীর পরিবর্তে আমার বোনকে দাবী করে বসে, তখন?'

'ও, তার অর্থ তুমি এখানে ডিউটি করার সময়ও নিজের বোনের হেফাজতের চিন্তাতেই ব্যস্ত থাকো? ধন্য তোমার বোনেরা, এমন ভাই ক'জনের ভাগ্যে জোটে!' মেয়েটি একটু হেসে কিছুটা তিরষ্কারের সুরেই বললো।

সঙ্গে সঙ্গে আনতানুসের চেহারা বেদনায় মলিন হয়ে উঠলো। দুঃখ ভারাক্রান্ত স্বরে সে বলে উঠলো, 'আফসোস! যদি আমি তাদের রক্ষা করতে পারতাম! আমি তো এক নাদান ভাই, যে তার বোনদের জন্য কিছুই করতে পারেনি!'

মেয়েটির দিকে তাকিয়ে সে আরো বললো, 'যদি সেদিন আমি তাদের রক্ষা করতে পারতাম তবে তোমাদের নিয়ে দুশ্চিন্তায় আমি এতটা পেরেশান থাকতাম না। তোমাদের নিরাপত্তার চিন্তায় অস্থির হয়ে আমাকে মহলের ভেতরেও আসতে হতো না, আর তুমিও আমাকে এ নিয়ে তিরষ্কার করতে পারতে না।'

মেয়েটি সমবেদনার সুরে বললো, 'দুঃখিত, আমি বুঝতে পারিনি আমার কথায় তুমি কষ্ট পাবে।'

আনতানুস তার চেহারায় উদাসভাব নিয়ে বললো, 'আমি আমার বোনদের রক্ষা করতে পারিনি বলেই তোমাদের নিরাপত্তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় থাকি। সেও ঠিক তোমার মতই ছিল। দয়া করে আমাকে আমার কাজে বাঁধা দিও না।'

সে অন্ধকারে তীর ছোঁড়ার মত মেয়েটির আবেগের ওপর যে তীর নিক্ষেপ করলো, সে তীর ব্যর্থ হলো না। মেয়েটি প্রশ্ন করলো, 'তোমার বোনদের কি হয়েছে? কেন তাদেরকে রক্ষা করতে পারলে না? কেউ কি তাদের হাইজ্যাক করে নিয়ে গেছে?'

'যদি ছিনতাইকারী কোন মুসলমান হতো, কিংবা আমার বোন কোন মুসলমানের সঙ্গে বেরিয়ে যেতো, তবে আমার কোন আফসোস থাকতো না।' সে বললো, 'মনকে এই বলে প্রবোধ দিতাম, সে তাকে বিয়ে করে নিয়েছে অথবা কোন আমীরের মহলে আশ্রয় পেয়েছে। কিন্তু আমার একটা নয়, দুটো বোনকেই খৃস্টানরা ধরে নিয়ে গেছে। আমি তাদের রক্ষা করতে পারিনি।'

মেয়েটি জিজ্ঞেস করলো, 'তারা কোত্থেকে কিভাবে হাইজ্যাক হলো?'

সে জেরুজালেমের সেই কাহিনী ও তার পালিয়ে আসার লোমহর্ষক এক বর্ণনা দিয়ে মেয়েটির আবেগের ওপর আঘাত হানলো। মেয়েটির চেহারা দেখে বুঝা যাচ্ছিল, তার কথার তীর মেয়েটির বুকে ঠিক মতই বিদ্ধ হচ্ছে।

সে আরও বললো, 'আমি সেখান থেকে পায়ে হেঁটে এখানে এসেছি। আমি সৈন্য বাহিনীতে ভর্তি হয়েছি শুধু আমার বোনের নয়, এমন আরও যেসব বোনদের খৃস্টানরা লাঞ্ছিত করেছে তার প্রতিশোধ নিতে।'

সে মেয়েটিকে আরও অনেক আবেগময় কথা শোনালো, যে

সব কথা মেয়েটার অন্তরে গিয়ে বিঁধলো।

আনতানুস ভালমতই জানতো, মহলের এসব রক্ষিতা মেয়েরা খুব আবেগী হয়। চারিত্রিক দিক থেকেও এরা থাকে দুর্বল স্বভাবের। কারণ সুস্পষ্ট, যদি একটি পুরুষের এক ডজন কিংবা তার চেয়েও বেশী স্ত্রী ও রক্ষিতা থাকে, তবে কোন নারীই আশ্বস্ত হতে পারে না, স্বামী কাকে বেশী ভালবাসে। ফলে, এরা থাকে ভালবাসার কাঙাল।

যুবতী মেয়েরা হয় আরো আবেগী। হেরেমের আশ্রিতা এসব মেয়েরা জানে, কয়েক বছর পর তার চাহিদা আর থাকবে না, জীবনেরও কোন মূল্য থাকবে না তার।

আনতানুস এটাও জানে, হেরেমের মেয়েরা তাদের স্বপ্ন ও ভালবাসাকে দাবিয়ে রাখে। তারা স্বামী বা মালিকের যুবক বন্ধুকে বা কোন যুবক চাকরকে দিয়ে তাদের প্রেমের নেশা পূর্ণ করে।

গোয়েন্দাগিরীর জন্য হেরেমের কোন মেয়ের বন্ধুত্ব তার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। এ মেয়েটিকে সে ক্ষেত্রে কাজে লাগানো যায় কিনা সেটাই বাজিয়ে দেখতে চাচ্ছিল সে। তাই মেয়েটা হঠাৎ আনতানুসের সামনে এসে পড়ায় মেয়েটির আবেগ নিয়ে সে একটু খেলে দেখলো।

গুমাস্তগীন ছিল বিলাসপ্রিয় শাসক। নিয়মিত মদের আসর বসতো তার মহলে। হেরেমের এসব মেয়েরা সে আসর গুলজার করে তুলতো।

মদ ও নারীর নেশায় যখন কেউ পড়ে তখন তার কথায় কোন

বাঁধন থাকে না। সুতরাং গোপন তথ্য এসব মহফিল ও আসর থেকেই জানা যায় বেশী।

আনতানুস ও তার সঙ্গীরা আলী বিন সুফিয়ানের কাছ থেকে প্রশিক্ষণ পেয়েছিল। দক্ষ গোয়েন্দা বাহিনী যেন নিশ্চিন্তে ও নির্ভাবনায় দায়িত্ব পালন করতে পারে সে জন্য আলী তাদের সব প্রয়োজন পূরণ করতেন। কখনো কোন অভিযোগ করার সুযোগ দিতেন না তাদের। সুলতান আইয়ুবীও তাদেরকে প্রচুর অর্থ ও বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দিতেন, যাতে তাদের মনে কোন কষ্ট ও অভিযোগ না থাকে।

কোন গোয়েন্দা শত্রু এলাকায় ধরা পড়ে মারা গেলে সুলতান আইয়ুবী তার পরিবারকে এত অর্থ দান করতেন যে, তার পরিবার ভবিষ্যতে কোন অভাব অনটনের শিকার হতো না। কারো মুখাপেক্ষী হওয়ার চিন্তা থাকতো না বলে তারা মনপ্রাণ ঢেলেই গোয়েন্দা কাজে সক্রিয় থাকতো এসব গোয়েন্দারা।

আনতানুস মেয়েটির ওপর এমন প্রভাব বিস্তার করলো, মেয়েটি চেহারা বলছিল, সে তার প্রেমে পড়ে গেছে।

আনতানুস যখন সেখান থেকে বিদায় নিচ্ছিল, মেয়েটি তাকে চাপা গলায় বললো, 'পেছনের দিকে একটি বাগিচা আছে, শেষ রাতের দিকে ওদিকেও একটু টহল দিও। অনাহূত কেউ প্রবেশ করতে চাইলে ওদিক দিয়েই ঢুকতে চেষ্টা করবে আগে।'

মেয়েটির ঠোঁটে তখন অর্থপূর্ণ হাসির রেখা। আনতানুস সে হাসির অর্থ বুঝতে পেরে নিজেও হেসে ফেললো। তারপর

মেয়েটির দিকে আরেকবার তাকিয়ে হাসি মুখে বেরিয়ে এলো প্রাসাদ থেকে।
রক্ষী বাহিনীর দায়িত্ব মালিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। দেহরক্ষী থেকে শুরু করে বাড়ী পাহারা দেয়াও এদের দায়িত্বের অন্তর্ভূক্ত।

সে দিনই রাতের বেলা। কেল্লার ভেতর মহলের গেটে বর্শা হাতে ফিটফাট পোশাক পড়ে দাঁড়িয়ে ছিল আনতানুস। ধোপদুরস্ত পোশাক ও চকচকে বর্শা হাতে দাঁড়িয়ে থাকা আনতানুসকে দেখাচ্ছিল বীর পুরুষের মত।
সঙ্গী গার্ড বললো, 'তোমাকে একেবারে অফিসারের মত লাগছে।'
রাতের শেষ প্রহর। আনতানুস সঙ্গীকে বললো, 'তুমি থাকো, আমি একটু চারদিকটা চক্কর দিয়ে আসি।'
সে ঘুরতে ঘুরতে বাগানে চলে এলো এবং ওখানে পায়চারী করতে লাগলো।
বাড়ীটা ছিল রাজমহলের মত। ভেতর থেকে গান-বাজনা ও নাচের ঝংকার ভেসে আসছিল। আনতানুস আসরের মেহমানদের এরই মধ্যে দেখে নিয়েছে। আমন্ত্রিত মেহমানদের মধ্যে দু'তিনজন খৃস্টানও ছিল।
সে বাগানে কিছুক্ষণ পায়চারী করলো। এক সময় পিছন দরোজা দিয়ে বেরিয়ে এলো সেই মেয়েটি। আনতানুসকে দেখতে পেয়েই দ্রুত তার কাছে এসে দাঁড়ালো।

'তুমি এত রাতে কি জন্য এখানে এসেছো?' মেয়েটি কাছে আসতেই আনতানুস তাকে জিজ্ঞেস করলো।
'আর তুমিই বা কেন বাগানে ঘুরাঘুরি করছো?' মেয়েটি পাল্টা প্রশ্ন করলো।
'তোমার আদেশ পালনের জন্য।' আনতানুস উত্তর দিল, 'তুমিই তো বলেছিলে, রাতের শেষ প্রহরে বাগানে টহল দিতে!'
'তাই! তুমি তো দেখছি খুব দায়িত্ববান লোক!'
আনতানুস এর কোন জবাব না দিয়ে প্রশ্ন করলো, 'এমন সরগরম আনন্দময় জলসা ছেড়ে বাইরে চলে এলে যে!'
'সেখানে আমার নি:শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে!' মেয়েটি বললো 'শরাবের গন্ধে আমার মাথা ঘুরে যায়, বমি বমি ভাব হয়।'
'তোমার কি মদের নেশা নেই?'
'না!' মেয়েটি বললো, 'আমি এখানকার কোন কিছুতেই অভ্যস্থ হতে পারিনি।'
মেয়েটি একটি পাথরের বেঞ্চের ওপর বসলো। বললো, 'বসো, তোমার সাথে গল্প করি।'
আনতানুস বললো, 'কেউ যদি দেখে ফেলে!'
'যারা দেখবে তারা তো মদের নেশায় চুর হয়ে আছে।' মেয়েটি বললো, 'পাশে বসো আর তোমার বোনের গল্প বলো, আমি শুনি।'
আনতানুস দ্বিধাজড়িত পায়ে এগিয়ে গিয়ে তার পাশে বসলো। কথা বলতে বলতে এক সময় দ্বিধা ও ভয় কেটে গেল তার।

তার কথা বলার ভঙ্গি ছিল চমৎকার। মেয়েটি ক্রমশ তার দিকে ঝুঁকে পড়তে লাগলো।

সে বোনের কথা বলতে বলতে শেষে তার নিজের কাহিনীতে চলে এলো। মেয়েটি মুগ্ধ বিস্ময়ে শুনতে লাগলো এক সুন্দর যুবকের বিচিত্র জীবন কাহিনী। তাদের মধ্যে যে সংকোচ ও জড়তা ছিল তা উড়ে গেল আনতানুসের গল্পের তোড়ে।

এক সময় আনতানুস বললো, 'বেশীক্ষণ এভাবে এখানে থাকা ঠিক নয় আমাদের। তাতে বিপদ হতে পারে! শেষে যদি কেল্লার মালিক তোমাকে খোঁজ করার জন্য চাকর-বাকরদের পাঠিয়ে দেয়, তবে আমরা ধরা পড়ে যাবো!'

মেয়েটি বললো, 'ভয় নেই, আমার অনুপস্থিতির কথা কেউ তাকে বলবে না। আর তার হাতের নাগালে এত নারী, আমার অভাব সে অনুভবও করবে না!'

'তবু, অনেক্ষণ হয় এসেছি। সঙ্গী প্রহরী যদি খুঁজতে খুঁজতে চলে আসে!'

'তাহলে বলো, কাল আবার আসবে?'

আনতানুস ফাতেমার কাছে আগামী রাতে আবার দেখা করার অঙ্গীকার করে চলে গেল ডিউটিতে। ডিউটি মানে, গেটের পাশে দুই প্রহরীর চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা।

ডিউটিতে ফিরে গিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মেয়েটির কথাই ভাবছিল আনতানুস। ফাতেমা তাকে বলেছে, সে মদকে ঘৃণা করে। তাকে যেভাবে আনন্দ-স্ফূর্তির উপকরণ বানানো হয়েছে, তাতেও তার বড় ক্ষোভ ও ঘৃণা।

মেয়েটি হলবের বাসিন্দা। তার বাবা তার প্রভাবশালী বন্ধু গুমাস্তগীনকে খুশী করার জন্য নামকাওয়াস্তে বিবাহের অনুষ্ঠান করে তাকে তুলে দিয়েছে তার হাতে।

ফাতেমার এ বর্ণনা থেকে বুঝা যায়, বর্তমান জীবনটা তার পছন্দ নয়। সে ভালবাসা ও প্রেমের কাঙাল এক প্রস্ফুটিত গোলাপ।

পরের রাতে সেই বাগানে আবার তাদের দেখা হলো। ফাতেমা আনতানুসের অপেক্ষায় খুবই অধীর ও পেরেশান হয়ে বসেছিল পাথরের এক বেঞ্চের ওপর। বসে বসে আনতানুস এলে তাকে কি বলবে মনে মনে রিহার্সাল দিচ্ছিল।

আনতানুস এলে ফাতেমা তাকে দেখেই বললো, 'যদি তুমি আমার রূপ ও যৌবনের আকর্ষণে মনে কোন খারাপ বাসনা নিয়ে এসে থাকো তবে তুমি ফিরে যাও! তেমন লোকের আমার কোন প্রয়োজন নেই।'

'যদি তুমি কোনদিন আমার কাছ থেকে কু-মতলবের আভাসও পাও, আমার মুখে থু দিয়ে চলে যেও।' আনতানুস বললো, 'আমি তোমাকে আমার বোনের মতই মনে করি।'

'না না, আগেই তুমি আমাকে তোমার বোন বানিয়ে নিয়ো না।' ফাতেমা বললো, 'কারণ আমি এখনো সিদ্ধান্ত নেইনি, আমি তোমার বোন হবো, না অন্য কিছু।'

'অন্য কিছু মানে!'

'ন্যাকা সেজো না। ভালবাসার কাঙাল এক যুবতীর সাথে একজন যুবকের কি সম্পর্ক হতে পারে এটা বুঝার বয়সও

এখনো হয়নি তোমার?'
হেসে দিল আনতানুস। বললো, 'তবে কি তুমি আমার সাথে পালিয়ে যেতে চাও?'
'এটা নির্ভর করছে তোমার ওপর।' মেয়েটি বললো, 'সারা জীবন তো আর চোরের মত এভাবে লুকিয়ে দেখা করা সম্ভব হবে না! আর তুমিও চিরদিন এখানে ডিউটিতে থাকবে না। জানি, হয়তো দশ দিন, বিশ দিন বা এক মাস থাকবে, তারপর? তারপর চলে যাবে অন্য কোথাও।
তুমি চলে গেলেও তোমার কথা আমার চিরদিন মনে থাকবে। হয়তো তোমার কথা মনে হলে অন্তরে কষ্ট পাবো। হয়তো তোমার কথা স্মরণ করে গোপনে কেঁদে কেঁদে বুক ভাসাবো। কিন্তু আমার করার আর কিছুই থাকবে না। কারণ তোমার মনে কি আছে তা তো আর আমি জানি না!'
এ রাতের সাক্ষাত তাদের উভয়ের জীবনে এক অক্ষয় স্মৃতি হয়ে গেল। একে অপরকে গভীরভাবে ভালোবেসে ফেললো ওরা।

তার পরের দিন। ভালবাসার জোয়ার ফাতেমাকে এতই উতলা করে তুললো যে, আবেগের বশে সে ভয়ানক এক দুঃসাহসী কাজ করে বসলো। আনতানুসের আপত্তি সত্ত্বেও সে তাকে নিজের কামরায় নিয়ে গেল।
গুমাস্তগীন সে রাতে বাড়ি ছিল না। তাই এ দুঃসাহসী কাজ করতে সাহস পায় ফাতেমা। এ সাক্ষাৎ উভয়ের জন্যই ছিল

আতংকজনক। ফাতেমা আবেগের মোহে সব কিছুই ভুলে গেল। ভুলে গেল মহলের মধ্যেও ষড়যন্ত্রের বীজ লুকিয়ে আছে। বেগম থেকে বাঁদী সকলেই একে অন্যের দোষ ত্রুটি খুঁজে বেড়ায়। বেগমরা স্বামীর কাছে, বাঁদীরা প্রভুর কাছে একে অন্যেকে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য সব সময় সচেষ্ট থাকে।

আনতানুসের ব্যক্তিত্ব ও কথার যাদু তাকে অন্ধ করে দিয়েছিল। ভালবাসা ও প্রেম পিপাসার আবেগের মোহে সে এসব কথা ভুলেই গিয়েছিল।

গভীর রাত। আনতানুস বসেছিল ফাতেমার কামরায়। কিন্তু তার ব্যক্তিত্ব ছিল প্রখর। সে এমন কোন ইঙ্গিতও করলো না, যাতে ফাতেমার যৌবন বা শরীরের প্রতি সামান্য লোভ-লালসা প্রকাশ পায়। তার এই চারিত্রিক দৃঢ়তা ফাতেমাকে আরো অভিভুত করে তুললো। আপাদমস্তক পবিত্র এক ভালবাসার মানুষ হয়ে গেল আনতানুস।

সে যখন তার কামরা থেকে বের হয়ে গেল, তখন ফাতেমার এমন অবস্থা, পারলে তখুনি সে তার সাথে বের হয়ে যায়।

আনতামুস যখন কামরা থেকে বের হচ্ছিল, তখন অন্দর মহলের অন্য এক মেয়ে তাকে দেখে ফেলে। কিন্তু মেয়েটি এ কথা ওদের বুঝতে না দিয়ে দ্রুত নিজেকে অন্ধকারে লুকিয়ে ফেলে।

অন্য এক রাতের ঘটনা। গুমাস্তগীন এ রাতেও মহলে

অনুপস্থিত। ফাতেমা রাতের আঁধারে বাগানে চলে এলো। আনতানুসও এসে পৌছলো ওখানে। এখন দু'জনের মাঝে কোন পর্দা নেই, নেই কোন বাঁধার দেয়াল।

ফাতেমা তাকে বললো, 'তুমি তো আমাকে বলেছিলে, তুমি তোমার বোনের প্রতিশোধ নিতে সুলতান সালাহউদ্দিনের সেনাবাহিনীতে ভর্তি হওয়ার জন্য বাড়ি ছেড়ে ছিলে। তবে তুমি এই বাহিনীতে ভর্তি হলে কেন?'

'কেন, এটা কি সুলতানের বাহিনী নয়?' আনতানুস এমনভাবে বললো, যেন সে এ ব্যাপারে কিছুই জানে না। সে বললো, 'এটাই তো মুসলিম সৈন্য বাহিনী। আর আমি তো জানি, মুসলিম বাহিনীরই সর্বাধিনায়ক সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী?'

'এ বাহিনী মুসলিম বাহিনী বটে, তবে এ বাহিনী গঠন করা হয়েছে সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য।' ফাতেমা বললো।

'এ তো বড় অন্যায় কথা!' আনতানুস অবাক হয়ে বললো, 'কি বলছো তুমি! তবে কি আমাদের এমন বাহিনীতে থাকা উচিত, যে বাহিনী সুলতান আইয়ুবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চায়? তারা তো মুসলমানদের সর্বনাশ করবে?'

'আমিও তাই মনে করি।' বললো ফাতেমা।

আনতানুস বললো, 'তুমি জানো না, জেরুজালেম ও আশপাশের যেসব অঞ্চলে খৃস্টানদের আধিপত্য আছে, সেখানকার মুসলমানরা সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীকে

তাদের ইমাম ও নেতা মনে করে।
তারা খৃস্টানদের অত্যাচারে সদা জর্জরিত ও আতংকগ্রস্থ। তারা বিশ্বাস করে, সুলতান আইয়ুবী তাদেরকে একদিন এই অবস্থা থেকে মুক্তি দেবেন।
ওসব অঞ্চলের মসজিদের ইমামগণ বলেন, এ জাতি তার পাপের প্রায়শ্চিত্য করছে। জেহাদের কথা ভুলে গেছে তারা। সুলতান আইয়ুবীর জেহাদীমন্ত্রে উজ্জীবিত মুজাহিদরা যদি কখনো এদিকে আসে, তাহলে হয়তো নাজাত পেতে পারো। তুমিই বলো, এখন আমি কি করবো?'
'তুমি এখান থেকে পালিয়ে যাও!'
'কিন্তু তোমাকে রেখে আমি কি করে অন্য কোথাও পালিয়ে যাই!'
'যদি তোমার সাহস থাকে তবে তুমি আমাকেও সঙ্গে নাও।'
'কিন্তু কোথায় যাবো?'
ফাতেমা বললো, 'আমি তোমাকে সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী পর্যন্ত পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করবো। তোমাকে আর এই সেনাবাহিনীতে থাকতে হবে না।'
'তুমি কি জন্য তোমার স্বামীর কাছ থেকে পালাতে চাও? সে তোমাকে দাসী বানিয়ে রেখেছে এ জন্য, নাকি সে বুড়ো বলে?'
'আমি এ ব্যক্তিকে ঘৃণা করি।' ফাতেমা উত্তর দিল, 'কেন ঘৃণা করি সে কারণ তো তুমি নিজেই বলে দিয়েছো। সে আমাকে দাসীর মত মহলের চার দেয়ালে বন্দী করে রেখেছে, সে বৃদ্ধও

বটে। কিন্তু সবচে বেশী ঘৃণার কারণ, সে আমার প্রাণপ্রিয় নেতা সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর বিরোধী। মুসলমান হয়েও সে খৃস্টানদের বন্ধু। যখন দেখি মুসলমানদের স্বার্থের চাইতে খৃস্টানদের স্বার্থ তার কাছে বড়, তখন তাকে খুন করে ফেলতে ইচ্ছে করে আমার।

এ মহলে বউ হয়ে আসার আগে আমার মনে একটি আকাংখা ছিল। আমার মনে হতো, আমি নূরুদ্দিন জঙ্গীর কাছে গিয়ে বলি, আমাকে আপনার সামরিক বাহিনীতে নিয়ে নেন। আমি খৃস্টান ও তাদের মিত্রদের বিরুদ্ধে জীবন বাজী রেখে যুদ্ধ করতে চাই।

সুলতান সালাহউদ্দিনের নাম আমি আগেও শুনেছি। তীর নিক্ষেপে আমি যথেষ্ট পটু। নিশানা ঠিক করতে এক সময় বহু প্রাকটিস করেছি। কিন্তু আমার সব আশা ও স্বপ্ন এ হতভাগার মহলে এসে নিঃশেষ হয়ে গেছে।

যখন আমি এ মহলে আসি, মনে মনে একটু গর্ব ছিল, আমি এক যোদ্ধার স্ত্রী হয়ে এসেছি। যে যোদ্ধা দেশ, জাতি ও দ্বীনের খেদমতে শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। কিন্তু সুলতান নূরুদ্দীন জঙ্গীর ওফাতের পর অবাক হয়ে দেখলাম, সে মরহুম জঙ্গীর একমাত্র হিতৈষী সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে।'

'তিনি আসলেই সুলতান আইয়ুবীর বিপক্ষে কি না, সে খবর তুমি সঠিক জানো?' আনতানুস জিজ্ঞেস করলো।

'হ্যাঁ, এ ব্যাপারে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই।' ফাতেমা

বললো, 'কিন্তু এ লোক বড় গভীর জলের মাছ! খলিফা আল মালেকুস সালেহের সাথেও তার বন্ধুত্ব, আবার খলিফার বিরোধী ওমরাদের সাথেও তার ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। এরা সবাই সুলতান আইয়ুবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। গুমাস্তগীন তাদের আশ্বাস দিয়ে রেখেছে, যুদ্ধের সময় সে তাদের সৈন্য দিয়ে সাহায্য করবে। আবার খৃস্টানদের সাথেও সুলতান আইয়ুবীর বিরুদ্ধে লড়ার জন্য গোপনে চুক্তি করে রেখেছে। তার আশা, আইয়ুবীর বিরুদ্ধে সম্মিলিত অভিযানের সময় সে বহু স্থান দখল করে নিতে পারবে। একদিন সে হারান ও বিজিত অঞ্চলের বাদশা হওয়ার স্বপ্ন দেখে।'

'এ নিয়ে কি তিনি কখনো তোমার সাথে আলোচনা করেছেন?'

'হ্যাঁ! সে জানে আমি সুলতান আইয়ুবীর ভক্ত!' ফাতেমা বললো, 'সুযোগ পেলেই সে সুলতান আইয়ুবীর বিরুদ্ধে আমাকে কথা শোনাতো। কিন্তু আমি তাতেও সুলতানের ব্যাপারে আমার মনোভাব পাল্টাইনি দেখে রাগ করে সে আমার সাথে কথা বন্ধ করে দিল। তাতেও কাজ না হওয়ায় সে আমাকে মারপিটও করেছে।

এ নিয়ে একদিন তার সাথে আমার তুমুল ঝগড়া হয়। শেষ পর্যন্ত সে রাগ করে এ পর্যন্ত বলেছে, 'আইয়ুবী কি তোকে জাদু করেছে? আমার এখানে থাকতে হলে সুলতানের নাম কোনদিন মুখেও আনতে পারবি না।'

এ ঘটনার পর কয়েকদিন আমাদের মধ্যে কথাবার্তা বন্ধ

ছিল। হঠাৎ এক রাতে সে আমার কামরায় এলো। আমার মন গলানোর জন্য মিষ্টি মিষ্টি কথা বলতে লাগলো। শেষে বললো, 'আরে, শরীয়তের হুকুম হচ্ছে, এক মুসলমানের সাথে আরেক মুসলমানের তিনদিনের বেশী কথা বন্ধ রাখতে নেই। স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া তো মামুলি ব্যাপার। স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া না হলে মিল মোহাব্বত বাড়ে না।'

তবু আমি চুপ করে রইলাম। সে বললো, 'শোন, তুমি যদি আমাকে অপছন্দ করো এবং আমার কাছ থেকে মুক্তি চাও, রাগ করে না থেকে আমাকে খোলাখুলি বলো। আমি এতটা নিষ্ঠুর নই যে তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমাকে আমি এই মহলের মধ্যে বন্দী করে রাখবো।'

তার এ কথায় আমি তো অবাক! বলে কি লোকটা! ভুতের মুখে রাম নাম! বললাম, 'দেখো, মারতে চাও আরো মারো, কিন্তু এ ধরনের নিষ্ঠুর ঠাট্টা করো না।'

'আমাকে বিশ্বাস করছো না! খোদার কসম, আমি তোমার সাথে কোন ইয়ার্কি করছি না। চাও তো কোরআন ছুঁয়ে শপথ করতে পারি। তুমি যদি চাও তোমার পছন্দের ছেলের কাছে আমি নিজ হাতে তোমাকে তুলে দেবো। সারা জীবন শুয়ে বসে কাটাতে পারো এমন সম্পদ সে বিয়েতে তোমাদের আমি উপহার দেবো।'

'কিন্তু কেন? কিসের বিনিময়ে এত বড় উদারতা দেখাতে চাও?'

'না না, এটাকে তুমি উদারতা বলো না, বলো ঋণ শোধ।

তুমি আমার ছোট্ট একটা উপকার করে দেবে এটুকু ওয়াদা শুধু চাই।'

'কি উপকার? আমার মত সামান্য এক নারী তোমার মত ক্ষমতাধরের এমন কি উপকার করতে পারবো, যার বিনিময়ে তুমি এতো ত্যাগ স্বীকারের ওয়াদা করছো!'

'পারবে, পারবে, তুমিই পারবে। তুমি তো জানো না, তুমি কি অসামান্য সুন্দরী! তোমার মত ষোড়শী রূপসীদের পক্ষেই এ কাজ করা সম্ভব।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'কি কাজ?'

'তোমাকে সুলতান আইয়ুবীর কাছে পাঠাবো। ওখানে তুমি সুলতানের বড় বড় সেনাপতিদেরকে তোমার রূপ দেখিয়ে তার বিরুদ্ধে নিয়ে যাবে। যাদের পারো তাদেরকে আমার পক্ষে নিয়ে আসবে।'

সে আরও বললো, 'তোমার সাথে তোমার মতই আরো দু'জন খৃস্টান মেয়ে থাকবে। তারা খুবই চালাক ও সতর্ক। তোমরা তিনজনে যদি চেষ্টা করো, মানুষ কেন, পাথরকেও গলাতে পারবে তোমরা।'

সে আমাকে কি করে কি করতে হবে সব বলতে লাগলো। বললো, 'সেখানে গিয়ে গোয়েন্দাদের মত কাজ করতে হবে তোমাদের। যদি তোমরা এই কাজ করে আসতে পারো, তবে এমন সীমাহীন সম্পদ পাবে, যা কোনদিন তুমি কল্পনাও করোনি। আর তোমাকে মুক্ত করে দিয়ে তোমার পছন্দসই যুবকের সাথে বিয়ে দিয়ে দেবো।'

কিন্তু আমি তার কোন শর্তই মানিনি।'

'তুমি মেনে নিলেই পারতে!' আনতানুস বললো, 'তাহলে আমরা নির্বিঘ্নে এখান থেকে বের হয়ে সুলতান আইয়ুবীর কাছে চলে যেতে পারতাম।'

'এই শয়তানটা ও তার খৃস্টান বন্ধুরা এমন ব্যবস্থা করে রেখেছে, শত্রু এলাকায় গিয়ে যদি কোন মেয়ে গাদ্দারী করে তবে তাকে সেখানেই হত্যা করে ফেলবে। তাদের সাথে গুপ্তঘাতক ফেদাইন দলের যোগাযোগ রয়েছে। তার কথা শুনে আমার অন্তরাত্মা খাঁচা ছাড়া হওয়ার জোগাড়।'

ফাতেমা আরো বললো, 'একবার মনে করেছিলাম, তার প্রস্তাব মেনে নেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাহসে কুলালো না।'

ফাতেমা আরো বললো, 'তখনও তোমার সাথে আমার পরিচয় হয়নি। হলে হয়তো অন্য রকম সিদ্ধান্ত নিতাম। বিশ্বাস করো, তোমাকে পেয়ে আমার প্রাণে নতুন করে সাহস ফিরে এসেছে, বুকে বল এসেছে। আমি তোমার অনুগ্রহ জীবনেও ভুলতে পারবো না। তুমি আমাকে তোমার মনের মধ্যে স্থান দিয়েছো, সেইটেই যথেষ্ট। চলো, আমরা এখান থেকে পালিয়ে যাই।'

'পালিয়ে যাওয়ার দরকার নেই। তুমি এখানে, এ কেল্লাতে থেকেই খৃস্টানদের বিরুদ্ধে এবং সুলতান আইয়ুবীর পক্ষে কাজ করতে পারবে।'

ফাতেমা অবাক হয়ে বললো, 'কি কাজ? কেমন করে?'

'যে কাজ তোমার মালিক গুমাস্তগীন সুলতান আইয়ুবীর

অঞ্চলে গিয়ে করতে বলেছিল, এখানেও আমরা সেই কাজ করবো, তবে তার পক্ষে নয়, তার বিপক্ষে। সুলতান আইয়ুবীরও নিশ্চয়ই গোয়েন্দার প্রয়োজন আছে। এখানে থেকেই তাঁকে এখানকার গোপন তথ্য জানিয়ে সাহায্য করতে পারি আমরা।'

'তুমি কেমন করে জানলে, সুলতান আইয়ুবীর গোয়েন্দার প্রয়োজন আছে এবং আমরা তার কাজে লাগতে পারবো?' ফাতেমা বললো।

'কারণ আমি নিজেই যে সুলতান আইয়ুবীর পাঠানো এক গোয়েন্দা!'

আনতানুসের এ বাক্যটি শুনে ফাতেমা এমন চমকে উঠলো, সহসা পথ আগলে তার বুকে কেউ খঞ্জর বসিয়ে দিলেও এতটা চমকাতো কিনা সন্দেহ।

'কেন? তুমি এত অবাক হচ্ছো কেন? সত্যি বলছি, আমি জেরুজালেম থেকে নয়, কায়রো থেকে এসেছি। আমার কোন বোনকে কেউ অপহরণ করেনি। গুমাস্তগীনের আস্থাভাজন হওয়ার জন্যই এ রকম গল্প ফাঁদতে হয়েছে আমাকে।'

'তুমি যেখানে এতবড় মিথ্যা বলতে পারো, সেখানে তোমার অঙ্গীকার ও ভালবাসা সবই মিথ্যা হতে পারে।' ফাতেমা বললো, 'তোমাকে আর কেমন করে বিশ্বাস করতে পারি!'

'একমাত্র ভালবাসার খাতিরেই আমি তোমাকে আমার গোপন পরিচয় জানিয়েছি।' আনতানুস বললো, 'বলতে পারো, আমি আমার জীবন তোমার পায়ের তলায় সমর্পণ করে দিয়েছি।

তুমি ইচ্ছে করলে আমার ভালবাসা অস্বীকার করে তোমার স্বামীর কাছে আমার আসল পরিচয় ফাঁস করে দিয়ে আমাকে হত্যা করাতে পারো।
তবে একটা কথা মনে রেখো, কোন গোয়েন্দাই তার পরিচয় অন্যকে জানায় না। কেবল তোমাকে প্রতারণা করতে পারবো না বলেই তোমার কাছে আমার সত্যিকার পরিচয় প্রকাশ করেছি। আমার আবেগ ও ভালবাসাই আমাকে এ কথা বলতে বাধ্য করেছে। তাই আমি নির্ভয়ে বলে দিয়েছি।
তোমার প্রতি ভালবাসার আরো প্রমাণ তখনি দেবো, যখন আমি এখানকার কাজ সমাধা করে ফিরে যাবো। সেদিন এখান থেকে আমি একাই যাবো না, তুমিও থাকবে আমার সাথে।
কিন্তু একটা কথা তোমাকে পরিষ্কার করে বলতে চাই, যদি আমার ভালবাসা ও আমার দায়িত্বের মাঝে কখনো সংঘাত বাঁধে, যদি ভালবাসা ও দায়িত্ব একে অন্যের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়, তবে আমি ভালবাসা কোরবানী দিয়ে আল্লাহর দ্বীনের স্বার্থে আমার দায়িত্ব পালনে অটল থাকবো। তোমাকে ধোঁকা দেবো না, আমার আসল পরিচয় গোপন রেখে তোমার ভালবাসা নেয়ার অন্যায় থেকে বাঁচার জন্যই তোমাকে এতগুলো কথা বললাম।
তুমি হয়তো জানো না, দায়িত্ব পালনের জন্য গোয়েন্দার কাছ থেকে কেমন কঠিন ওয়াদা ও কোরবানী নেয়া হয়। সৈনিকরা যুদ্ধের ময়দানে শহীদ হয়ে যায়, সাথীরা তার লাশ সসম্মানে

দাফন করে। কিন্তু গোয়েন্দারা মারা যায় না, তারা ধরা পড়ে শত্রুর হাতে।

শত্রুরা তাকে বন্দী করে নিয়ে যায়। তার কাছ থেকে কথা আদায় করার জন্য এমন সব শাস্তি দেয়, যে কথা শুনলে তুমি অজ্ঞান হয়ে যাবে। সেখানে সে মারা গেলেও পৃথিবীর কেউ তার দায়িত্ব নেয় না। কেউ এগিয়ে আসে না তার লাশটা দাফন পর্যন্ত করতে।

গোয়েন্দাদের জীবন বড়ই ঝুঁকিপূর্ণ জীবন। ঈমানের বলিষ্ঠতাই ওদের সম্পদ, সে ঈমান নিয়েই আমি এখানে এসেছি। তোমার সঙ্গে ভালবাসা করেছি, কিন্তু দায়িত্বের ব্যাপারে আমি ইস্পাতের মত কঠিন থাকবো। কখনো অবিশ্বাসীর মত কাজ করবো না।'

ফাতেমা তন্ময় হয়ে শুনছিল তার কথা। আবেগে থরথর করে কাঁপছিল আনতানুসের হাত। ফাতেমা তার হাত দুটো নিজের হাতে নিয়ে চুমু খেলো। মুখে বললো, 'তুমিও আমাকে অনুরূপ সুদৃঢ় পাবে। এখন বলো কি করবো?'

আনতানুস তাকে কি করতে হবে সবকিছু বুঝিয়ে বললো। বললো, 'গান বাজনার আসরে এখন থেকে আর অনুপস্থিত থাকা যাবে না। বিশেষ করে যে মাহফিলে খৃস্টানরা থাকে সে সব মাহফিলে সরাক্ষণ তোমাকে উপস্থিত থাকতে হবে।

যদি এ জন্য দু'ঢোক মদও পান করতে হয়, মেহমানের সন্তুষ্টির জন্য তাও করতে হবে। তাদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশায় সংকোচ বোধ করবে না। তাদের সব কথা

মনোযোগ সহকারে শুনবে।
সুলতান আইয়ুবীর যতই নিন্দা করুক, তার প্রতিবাদ করবে না। বরং তাদের কথায় সায় দিয়ে খৃস্টান সেনাপতিদের কাছ থেকে তাদের মনের কথা বের করে নেবে।
তারা কিভাবে যুদ্ধের পরিকল্পনা করছে খুঁটিয়ে বের করার চেষ্টা করবে। বেশী করে মনোযোগ দিয়ে শুনবে খৃস্টানদের কথা।'
এরপর আনতানুস সেই দুই সেনাপতির কথা জিজ্ঞেস করলো, যারা হিন্দুস্থানী হিসাবে পরিচিত ছিল।
'শামস বখত ও সাদ বখতকে আমি খুব ভাল করে চিনি।' ফাতেমা বললো, 'গুমাস্তগীন তাদের ছাড়া কোন সিদ্ধান্তই নেয় না। তারা প্রায়ই এখানে আসে। তারা গান বাজনায়ও শরীক হয় কিন্তু তারা মদ পান করে না।'
'তুমি তাদের সাথে খুব ঘনিষ্ঠ হতে চেষ্টা করবে!' আনতানুস বললো, 'কথায় কথায় তাদেরকে প্রশ্ন করবে, 'আর রিস্তানে কি এখন বরফ গলছে?'
সেও তোমাকে প্রশ্ন করবে, 'কেন, তুমি কি আর রিস্তান যাবে নাকি?'
তুমি হেসে বলবে, 'ইচ্ছা তো তাই ছিল।'
তারপরে তারা তোমার সাথে কথা বলবে। আর সম্ভবত: জিজ্ঞেস করবে, 'ওদিক দিয়ে কে আসছে?'
তখন তুমি বলবে, 'সেখানে গেলেই জানতে পারবে।'
ফাতেমা বললো। 'আমি তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি

না।’

‘আমি যেভাবে বললাম সেভাবে কাজ করো। ধীরে ধীরে সব বুঝতে পারবে।’ আনতানুস বললো, ‘ফাতেমা! আমি তোমাকে কখনও এমন ঝুঁকি ও ঝামেলায় ফেলতাম না। কিন্তু কঠিন দায়িত্বের খাতিরে, ইসলাম ও মুসলিম জাতির অস্তিত্বের খাতিরে বাধ্য হলাম।

আমার সবচেয়ে প্রিয় যে প্রাণ, সেটাও এই ফরজ পালনের জন্য কোরবানী করতে বাধ্য আমি। ভয় পেয়ো না ফাতেমা, আমরা আল্লাহর কাছ থেকে এসেছি, মরার পর আবার তার কাছেই ফিরে যাবো। সামনে যে কঠিন বিপদ ও পরীক্ষা রয়েছে, সে বিপদ আমরা হাসি মুখে বরণ করে নেবো তার সন্তুষ্টির আশায়।

যদি আমরা দু'জন কখনো বন্দী হয়ে যাই, যদি কয়েদখানার দুর্ভোগ নেমে আসে আমাদের জীবনে, অথবা যদি আমরা মরেও যাই, তবু আমাদের রক্ত বৃথা যাবে না। মহান আল্লাহ কখনো আমাদের কোরবানী ভুলে যাবেন না। ইসলামের খেদমত ও শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষায় আমাদের এ রক্ত দান আমাদের পরকালীন মুক্তি ও জান্নাতের জামিন হবে।’

‘এ ব্যাপারে তুমি আমাকে পাহাড়ের মতই অটল ও সুদৃঢ় পাবে।’ ফাতেমা বললো, ‘তুমি আমার মনে সেই প্রেরণা জাগিয়ে দিয়েছো, এতদিন আমি যার স্বপ্ন দেখেছি। আমার সারা জীবনের স্বপ্ন ও সাধনাকে সফল করার পথ বের করে দিয়েছো তুমি। আমার প্রতিটি পূণ্যের বদলা তুমি আল্লাহর

কাছ থেকে পাবে।'
'আমি চলে যাচ্ছি।' আনতানুস বললো, 'তোমার দায়িত্ব পালন আজ এবং এখন থেকেই শুরু করো।'

আনতানুস চলে গেল। ফাতেমা তার চলে যাওয়া পথের দিকে বহুক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইলো।
সে যখন তার চোখের আড়াল হয়ে গেল, তখন ফাতেমা অনুভব করলো, সে একা নয়, তার পাশে আরও একজন দাঁড়িয়ে আছে।
সে চমকে তাকিয়ে দেখলো, মহলের একটি মেয়ে সত্যি তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। সেও ফাতেমার মত যুবতী ও সুন্দরী।
মেয়েটি তাকে বললো, 'ফাতেমা! তোমার এই ভালবাসার পরিণতি কি হবে সে বিষয়ে একটু ভেবে দেখেছো? তুমি মুক্ত নও। আমার মনের আবেগও ঠিক তোমার মতই। আমিও খাঁচা ভেঙ্গে উড়ে যাওয়ার কথা চিন্তা করেছি। কিন্তু এটা সম্ভব নয়।
চিন্তা করে করে আমি কোন কুল কিনারা পাইনি। শেষে ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিয়েছি আমার জীবন। মনকে প্রবোধ দিয়েছি এই বলে, আমার কপালে যা লেখা ছিল তাইতো আমি পেয়েছি! তুমিও তোমার মনকে বুঝাও। অবাস্তব স্বপ্ন কল্পনা পিষে মারো। যদি মনের শান্তি পেতে চাও তবে আরও অনেক পথ আছে।'
'কি বলতে চাও তুমি?'

‘একজন রক্ষী সেনাকে এত উচ্চ সম্মান দিও না।’

‘আমি কাকে কতটুকু সম্মান দেবো, সেটা আমার ব্যাপার। এ নিয়ে তোমার নাক না গলালেও চলবে।’ ফাতেমা বিস্ময় ও ক্রোধের সাথে বললো।

‘কিন্তু তুমি যে মূল্যে এ সওদা কিনতে চাচ্ছো, সে বড় কঠিন মূল্য। এত চড়া যে, তুমি কল্পনাও করতে পারবে না।’

‘কি বলতে চাও তুমি? চড়া কি অ-চড়া তার তুমি কি জানো?’

‘আমি যা জানি তার সবটা তোমাকে বলিনি।’ মেয়েটি বললো, ‘দেখো, আমার কাছে কোন কথা গোপন করার চেষ্টা করো না। তোমাদের অনেক কথাই আমি শুনেছি। তুমি তার সাথে যে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছো, সে এক কঠিন কারবার! তার জন্য অশেষ মূল্য দিতে হবে তোমাকে।’

এই বলে সে সেখান থেকে চলে গেল। ফাতেমা সেখানেই অন্ধকার বাগানে চিন্তাযুক্ত মনে একাকী পায়চারী করতে লাগলো।

তার মনে পড়লো, আনতানুস তাকে বলে গেছে, ‘আজ থেকেই কাজ শুরু করো।’

তার আরও মনে পড়লো, সে তো আনতানুসের কাছে স্বীকার করেছে, সে সর্বদা দৃঢ়চিত্ত ও অটল থাকবে। সে আপন মনেই বলতে লাগলো, ‘মহলে তো এমন কত গুজবই চলে আসছে!’ মেয়েটির ওপর তার ভীষণ রাগ হলো, সে তাকে অভিশাপ দিতে লাগলো। কিন্তু তারপরই তার মনে হলো, অধিকাংশ মেয়েই তো অন্য মেয়ের দোষ ত্রুটি মালিকের কাছে বলে

তাকে ছোট করতে ও বিপদে ফেলতে চায়। কিন্তু এ মেয়ে তো তা করেনি!

কোন মেয়ে অন্যের ত্রুটি দেখলে তখনি তাকে বুঝিয়ে সাবধান করে, যখন সে তার মঙ্গল চায়। এ মেয়ে যখন আমাকে সাবধান করেছে তখন তার ওপর এটুকু ভরসা অন্তত করা যায়, সে এ কথা মালিকের কানে দেবে না। এ কথা মনে হতেই সে একটু শান্তি ও স্বস্তি পেলো।

কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হলো, মেয়ে মহলে কোন কথা গোপন থাকে না। আর প্রেমের কথা বাতাসের আগে উড়ে।

ফলে যতবারই মেয়েটির কথা মনে হলো ততবারই সে শঙ্কিত বোধ করলো।

যে কোন মুহূর্তে যে কোন অঘটন ঘটে যাওয়ার আশঙ্কা সে উড়িয়ে দিতে পারলো না। স্বস্তির বদলে অজানা ভয় ও শংকার এক হীমশীতল স্রোত বুকে নিয়ে সময় কাটতে লাগলো তার।

দু'তিন দিন কেটে গেল, কোন অঘটন ঘটলো না। চতুর্থ দিন রাতে শামস বখত ও সাদ বখতের সাথে সাক্ষাৎ হলো তার।

গুমাস্তগীন মাহফিল সাজিয়ে বসেছে। সেনাপতি, খৃস্টান উপদেষ্টা ও উচ্চ সামরিক অফিসারদের মনোরঞ্জনের দিকে সব সময়ই সে বিশেষ খেয়াল রাখে। এ ব্যাপারে সে খুব উদারহস্ত। আমোদ-স্ফূর্তির মাধ্যমে তাদের সে সব সময় নিজের হাতের নাগালে রাখতে চায়।

এ দু'তিন দিনে আনতানুস ফাতেমাকে ভালই ট্রেনিং দিয়েছে। সে ট্রেনিংয়ের ফলে ফাতেমা এ জলসায় আনন্দের সাথেই

শরীক হয়ে গেলো। গুমাস্তগীন ফাতেমার এমন পরিবর্তন দেখে একটু আশ্চর্য হলো, মনে মনে খুশীও হলো।

সে মেহমানদের সাথে প্রাণ খুলে হাসছিল, কথা বলছিল। এ দেখে বেশ পুলকিত বোধ করলো গুমাস্তগীন।

ফাতেমা এক সময় সেনাপতি শামস বখতের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। নানা কথার ফাঁকে এক সময় বললো, 'এখন কি আর রিস্তানে বরফ গলা শুরু হয়েছে?'

সেনাপতি শামস বখত চমকে উঠলো। গুমাস্তগীনের মত সতর্ক ও শক্ত মানুষের কেল্লার অন্দর মহলের কোন নারীর এমন গোপন তথ্য জানা থাকার কথা নয়। এমনটি আশা করা দুরাশা মাত্র। কারণ, এটা সুলতান আইয়ুবীর গোয়েন্দাদের একটা গোপন কোড। এ প্রশ্নের মাধ্যমে গোয়েন্দারা একে অপরকে চিনতে পারে। এ শব্দ একমাত্র নির্দিষ্ট গোয়েন্দা ছাড়া আর কেউ উচ্চারণ করতে পারে না।

শামস বখত ভাল করেই জানতো, এ কেল্লায় এমন কোন গোয়েন্দা বন্দী নেই, যার কাছ থেকে সে এ শব্দ শুনতে পারে। শামস বখত দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে সূত্রের পরবর্তী সংলাপ উচ্চারণ করলো, 'কেন তুমি কি আর রিস্তান যেতে চাও?'

ফাতেমা হেসে বললো, 'ইচ্ছা তো তাই ছিল।'

সেনাপতি শামস বখত কথা বলতে বলতে তাকে নিয়ে একদিকে সরে গেলো। অন্যান্য লোকেরা সবাই মদের নেশায় চুর হয়ে রয়েছে।

শামস বখত তাকে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি তো জানো আমি সেনাপতি?'

'আমি তার চেয়েও আরো বেশী জানি।'

ফাতেমার হাসির মধ্যে কোন উপহাসের ভাব ছিল না, বরং সহজ সরল আত্মবিশ্বাসে দীপ্ত ছিল সে হাসি।

'কে এসেছে?' শামস বখত গোপনে জিজ্ঞেস করলেন।

'সময় হলে তাকে আপনি নিজেই দেখতে পাবেন।' ফাতেমা বললো।

'তুমি কি জানো, আমাকে ধোঁকা দেয়ার পরিণাম কি হতে পারে?'

'ধোঁকা নয়।' ফাতেমা বললো, 'আপনি অগ্রসর হয়ে দরোজার দিকে চলে যান। গেটে দু'জন রক্ষীকে দাঁড়ানো পাবেন। জিজ্ঞেস করবেন, জেরুজালেম থেকে কে এসেছে?'

সেনাপতি শামস বখত দরোজার দিকে এগিয়ে গেলো। সেখানে দু'জন রক্ষী দাঁড়িয়ে ছিল, যাদেরকে তিনি চিনতেন। তাদের তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের মধ্যে কে জেরুজালেম থেকে এসেছো?'

আনতানুস সামনে এগিয়ে বললো, 'জ্বি, আমি জেরুজালেম থেকে এসেছি।'

শামস বখত তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি যখন আর রিস্তান থেকে এসেছ তখন সেখানে বরফ গলা শুরু হয়েছে নিশ্চয়ই!'

'কেন, আপনি কি আর রিস্তান যাচ্ছেন?' আনতানুস জিজ্ঞেস করলো।

'ইচ্ছা তো তাই ছিল।' সেনাপতি হেসে ফেললেন।
যখন তার পূর্ণ বিশ্বাস এসে গেল, আনতানুস সত্যি একজন গোয়েন্দা, তখন তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই মেয়েটা তো আমাদের সাথে প্রতারণা করছে না?'
'না।' আনতানুস উত্তর দিল, 'সাক্ষাতের সুযোগ দিন, সমস্ত কথাই বলে দেব।'

শামস বখত এক সেনাপতি, সুযোগ সৃষ্টি করা তার পক্ষে কঠিন ছিল না। সাক্ষাতের সুযোগ করে দেয়া হলো।
আনতানুস হাজির হলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কেমন করে ফাতেমাকে জালে আটকালে? আর তাকে কেমন করেই বা বিশ্বাসযোগ্য মনে করেছো, যার দরুণ তাকে তুমি গোপন সংকেতও জানিয়ে দিয়েছো?'
আনতানুস শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সব ঘটনা তার কাছে বর্ণনা করলো। কেমন করে এ মেয়ের সাথে সাক্ষাৎ হলো, তাদের মাঝে কি কি কথা হয়েছে, কিছুই বাদ দিল না।
'আমি একটি ভয়ের আশংকা করছি।' সেনাপতি শামস বখত বললেন, 'তুমি তরুণ যুবক! সুন্দর চেহারার সুগঠিত পুরুষ! মেয়েটিও যুবতী, সেই সাথে অসাধারণ সুন্দরী! তার আবেগে সীমালংঘন করার সম্ভাবনা আছে। তোমার মধ্যেও আবেগের প্রাবল্য আছে, নইলে তুমি তার কামরায় যাওয়ার দুঃসাহস করতে না।
এতে যে ভয়ানক ঝুঁকি ও বিপদ আছে তুমি সেদিকে খেয়াল

করোনি। এই অসাবধানতা ঠিক হয়নি। মেয়েদের মধ্যে ভালবাসা ও বিশ্বাসযোগ্যতা দুটোই উষ্ণ থাকে। তুমি তাকে ভালবাসাও দিয়েছো এবং পূর্ণ বিশ্বাসও তাকে দান করেছো। কিন্তু এ বয়সী মেয়েদের আবেগ চঞ্চল ও ক্ষণস্থায়ী হয়।
আমার ভয় হচ্ছে, তোমার প্রেমের আবেগ তোমার দায়িত্ববোধকে না ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংস করে দেয়।
যৌবনের জ্বালা ও প্রেমের আবেগ একত্রিত হয়ে বারুদ হয়ে যায়। তুমি কি আমাকে বিশ্বাস করাতে পারবে, তোমার অন্তরে ঐ মেয়ের প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি হয়নি? আমি তোমার বিশ্বাসের পরীক্ষা নিতে চাই।'
'আমি সে মেয়েকে শুধু কাজ সমাধা করার খাতিরেই তাকে বশীভূত করতে চেয়েছি।' আনতানুস বললো, 'কিন্তু আমি এ কথাও অস্বীকার করতে পারবো না, আমি তাকে গভীরভাবে ভালবেসে ফেলিনি। আমি আপনাকে আল্লাহ্ ও রাসূলের কসম খেয়ে বলছি, এ ভালবাসা আমার দায়িত্ববোধের ওপর কখনোই প্রাধান্য পাবে না।'
এরপর দু'জনের মাঝে তাদের দায়িত্ব নিয়ে নানা কথা হলো। সেনাপতি শামস বখত তাকে কিছু নির্দেশ দান করে বিদায় দিলেন।
সে দিনই শামস বখত তাঁর ভাই সাদ বখতকে বললেন, 'সুলতান আইয়ুবী এখানে আরও একজন লোক পাঠিয়েছেন। তার নাম আনতানুস। সে এখানকার রক্ষী দলে অন্তর্ভুক্ত হতে সক্ষম হয়েছে।'

এ দুই ভাইয়ের নিজস্ব গার্ড বাহিনী আছে। তাদের আর্দালী, দুই বডিগার্ড এবং চাকর সুলতান আইয়ুবীর কমাণ্ডো সৈনিক। শামস বখত তার ভাইকে আরো বললেন, 'আমাদের কাছে আরও একজন লোক এসেছে ঠিকই, কিন্তু সে এখানে এসেই এক সমস্যা বাঁধিয়ে বসেছে। সে কেল্লার মালিকের নিজস্ব পুকুর থেকে একটি মাছ বড়শিতে গেঁথে ফেলেছে। এটা মোটেও আনন্দের নয়, বরং একটা ভয়ের কারণ।'

শামস বখত তার নিজস্ব লোকদের কাছে এ সমস্যা ও ভয়ের কারণ সবিস্তারে বর্ণনা করে তাদের সতর্ক করে দিয়ে বললেন, 'এখন পর্যন্ত হারান প্রদেশে আমাদের একটি গোয়েন্দাও গ্রেফতার হয়নি। আমার ভয় হচ্ছে, আনতানুস গ্রেফতার হয়ে যাবে।

আমরা তার প্রতি দৃষ্টি রাখবো। শেষ পর্যন্ত তোমাদের সকলকেই প্রস্তুত থাকতে হবে যে কোন পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য। যদি সে ধরা পড়ে যায় তবে আমাদের অনেক বিপদ ও লাঞ্ছনা সহ্য করতে হবে।

আরও ভয় হচ্ছে, সে শাস্তির ভয়ে আমাদের সবার নাম, পরিচয় বলে দিতে পারে। তখন বিষয়টা সামাল দেয়া খুব কঠিন হয়ে যাবে। কিন্তু সুলতান আইয়ুবীর কথা মনে করে ভয় ও লজ্জিত হচ্ছি এই কারণে, তিনি যখন বলবেন, দু'জন সেনাপতি ও ছয়জন কমাণ্ডো মিলে একজন গোয়েন্দাকে রক্ষা করতে পারলে না, তখন কি জবাব দেবো?'

'আপনারা আছেন, আমরা এখানে আরো ছয়জন আছি, তখন

এখানে আরেকজনকে পাঠাবার কি দরকার ছিল?' এক সঙ্গী বললো।

'হয়তো এরও প্রয়োজন ছিল।' অন্য একজন বললো, 'যে প্রয়োজন পূরণ করার জন্য তিনি নতুন একজনকে পাঠানো দরকার মনে করেছেন। গুমাস্তগীনের অন্দর মহলের খবর আমাদের হাতে নেই। সেখানকার খবরও নেয়া আবশ্যক।'

'তোমরা এ নিয়ে আর বিতর্কে যেও না। আমার মনে হয়, এ সিদ্ধান্ত হাসান বিন আব্দুল্লাহর। এ নিয়ে আমাদের বিতর্ক না করলেও চলবে। শুধু আমি তোমাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করেছি, সে ব্যাপারে খুব হুশিয়ার ও সাবধান থাকবে।

আরেকটি কথা, এমনও হতে পারে, মেয়েটিকে এখান থেকে সরিয়ে নেয়ার প্রয়োজন পড়তে পারে। কোন গোপন ও নিরাপদ স্থানে তাকে রাখার প্রয়োজন হতে পারে, এ বিষয়েও সতর্ক থেকো।'

'আমরা যে কোন পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত আছি।' সকলেই সমস্বরে বললো, 'শুধু আমাদের দরকার সময় মত সংবাদ পাওয়া।'

'সংবাদ যথা নিয়মে পৌছবে, এ জন্য নতুন করে কোন বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব নয়।' শামস বখত বললেন, 'এমনও হতে পারে, যখন আনতানুস যাঁতাকলে পিষ্ঠ হচ্ছে বা তার হাড় গুঁড়ো হচ্ছে, তখন এসে সংবাদ পৌছবে আমাদের কাছে। সে অবস্থাও আমাদের মেনে নিতে হবে। বেশী নড়াচড়া করতে গেলে আরো বড় রকম সমস্যা বেঁধে যেতে পারে। দোয়া

করো, সে রকম যেনো কিছু না ঘটে।'

'আপনারা দুই ভাই সেনাপতি, আপনারা কি মনে করেন, আমরা অন্য কারো সাহায্য ছাড়াই যুদ্ধে সুবিধা করতে পারবো?' গুমাস্তগীন সেনাপতি শামস বখত ও সাদ বখতকে প্রশ্ন করলেন, 'আপনারা দু'জনই জানেন, সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর বিরুদ্ধে আমরা কয়েকজন প্রকাশ্যে ঐক্যবদ্ধভাবে সামরিক জোট গঠন করলেও ভেতরে ভেতরে সবাই পৃথক পৃথক প্ল্যান নিয়ে বসে আছি।

সুলতান আল মালেকুস সালেহ তো শিশুমাত্র। তিনি যে সব আমীরদের হাতের খেলার পুতুল, তারা তো সালাহউদ্দিন আইয়ুবীকে পরাস্ত করতে পারলে, আস সালেহকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে প্রত্যেকেই স্বাধীন সুলতান বলে ঘোষণা দিয়ে দেবে।

মুসাল প্রদেশের গভর্ণর সাইফুদ্দিন আমার বন্ধু! সুলতান আইয়ুবীর সেও একজন শত্রু! কিন্তু সেও একজন স্বাধীন সুলতান হতে চায়, পৃথক রাজ্য ঘোষণা করতে চায়।

আপনাদের ভালভাবেই জানা আছে, আমি হারান প্রদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে অধিক মাত্রায় সৈন্য সংগ্রহ করে বাহিনী করেছি।

আমি খৃস্টান শাসক রিজন্যাল্ট ও তার সমস্ত বন্দী সৈন্যদের এ শর্তেই মুক্তি দিয়েছি, সালাহউদ্দিনের সাথে যখন মোকাবেলায় নামবো তখন খৃস্টানরা আমাকে সহযোগিতা করবে। তারা সুলতানের বাহিনীর পিছন ও পাশ থেকে হামলা করে তাদের

গতি আমার দিক থেকে অন্য দিকে সরিয়ে দিবে।'

'যদি আমরা সফল হই, তবে একটি বিশাল এলাকা আপনার পতাকা তলে এসে যাবে। আমি আশা করি, আমরা সুলতান আইয়ুবীকে পরাজিত করতে পারবো। আমরা জানি, তাঁর রণকৌশল কি! যদি তাঁর সেনাবাহিনী জীবনবাজী রেখে যুদ্ধ করে তবে আমরা তার চেয়েও বেশী বাহাদুরী দেখিয়ে যুদ্ধ করবো।

সালাহউদ্দিন একবার হলবের মুসলমানদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। হলবের অধিবাসীরা তার গতি রোধ করে ফিরিয়ে দিয়েছে তাকে।

সেই ঘটনা আমাদের সৈন্যদেরও মনোবল বাড়িয়ে দিয়েছে। হলবের অধিবাসীদের চেয়ে আমাদের সৈন্যরা কোন অংশেই কম নয়। সাহস ও বীরত্বে তারা হলববাসীদেরও পেছনে ফেলে দেবে। তাছাড়া আপনার মত অভিজ্ঞ সেনানায়কের নেতৃত্ব তো আছেই।' বললেন সেনাপতি শামস বখত।

সাদ বখত সবকিছু নীরবে শুনছিল, গুমাস্তগীন তাকে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার অভিমত কি?'

'আমি মনে করি, বিজয় আমাদের নিশ্চিত। ময়দানে আমাদের সৈন্যরা আপনাকে নিরাশ করবে না।' বললো সাদ বখত।

দু'ভাইয়ের কেউ তাকে এ কথা স্মরণ করিয়ে দিল না, সুলতান আল মালেকুস সালেহ খৃস্টান শাসক রিমাণ্ডকে অগ্রিম স্বর্ণ মূল্য দিয়ে তার সমর্থন আদায় করেছিল। সুলতান আইয়ুবী

হলব অবরোধ করলে রিমাণ্ড সৈন্যবাহিনী নিয়ে এগিয়ে এসেছিল ঠিকই, কিন্তু সুলতান আইয়ুবীর কমাণ্ডো বাহিনীর প্রতিরোধে পড়ে যুদ্ধ না করেই স্বসৈন্যে দেশে ফিরে যায়।
সেনাপতি দুই ভাই কোন বিষয়েই গুমস্তগীনের সঙ্গে বিতর্কে গেল না। তার সমালোচনা না করে বরং তাকে উৎসাহিত করলো।
তারা পরামর্শ দিল, 'এখন সুলতান আইয়ুবী আর রিস্তান পাহাড়ী এলাকায় বসে আছে। আর রিস্তান পর্বত শ্রেণীকে হিম্মাতের শৃঙ্গ বলা হয়। এই পাহাড়ী প্রান্তরে থাকতে থাকতে শীতে আইয়ুবীর সৈন্যরা এখন কাহিল হয়ে পড়েছে। ওখানেই যদি আমরা তাকে আক্রমণ করি তবে তাঁকে সহজেই পরাজিত করা সম্ভব।'
'আমার কাছে এমন ধরনের সংবাদ আসছে, সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর গোয়েন্দা নাকি আমাদের মাঝে বিচরণ করছে। আমাদের প্রতিটি খবর তার কাছে পৌঁছে দেয়া হচ্ছে।' গুমাস্তগীন বললেন, 'আপনারা দুই সেনাপতি এদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন ও তল্লাশী চালাবেন।'
'এ কথা বলার প্রয়োজন করে না! আমরা সতর্ক আছি।' সাদ বখত বললো, 'আমরা জানি, সুলতান আইয়ুবীর গোয়েন্দারা খুব হুশিয়ার। আমরাও এখানে গোয়েন্দা ছড়িয়ে রেখেছি, যাদের প্রতি সন্দেহ হয় ও সন্ধান পাওয়া যায়, তাদের খবর গোপনে জানাতে বলেছি। গোয়েন্দা সংস্থা আমাদেরকে অবহিত করবে।'

'আমি এ ব্যাপারে খুবই কঠিন!' গুমাস্তগীন বললো, 'যদি আমার আপন সন্তানের ব্যাপারেও সন্দেহ হয়, সে অপরের গোয়েন্দা, তাকে যাঁতাকলে পিষে মারবো। বিন্দুমাত্র দয়া দেখানো হবে না তার প্রতি।'

গুমাস্তগীনের মনে এমন কোন সন্দেহ ও ধারণাই আসেনি, সে যে সেনাপতিদের সাথে কথা বলছে, তারা কখনো সুলতান আইয়ুবীর গোয়েন্দা হতে পারে! অথচ এরা ছিল আইয়ুবীর বাহিনীর দুই জাদরেল সেনা অফিসার।

গুমাস্তগীনের সাথে কথা শেষ করে তাঁরা যখন একা হলো, তখন তারা নিজস্ব পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করলো। তারা সিদ্ধান্ত নিলো, অভিযান চালানোর আগেই সুলতান আইয়ুবীকে বিস্তারিত সংবাদ জানিয়ে দেয়া হবে। যুদ্ধের সামান্য মহড়া দেখিয়ে সুলতান আইয়ুবীর অবরোধের মাঝে পড়ে গিয়ে তারা আত্মসমর্পণ করবে।

দীর্ঘ সময় ধরে দুই ভাই পরিকল্পনার খুঁটিনাটি প্রতিটি দিক নিয়ে গভীরভাবে পর্যালোচনা করলো।

তখনো পর্যন্ত গুমাস্তগীন কবে আক্রমণ করবে তা ঠিক হয়নি। দুই ভাই-ই আক্রমণের নির্দিষ্ট সময় জানা জরুরী মনে করলো।

তারা গুমাস্তগীনকে দ্রুত আক্রমণ করার জন্য চাপ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিল এবং আরো সিদ্ধান্ত নিল, আক্রমণের দিন তারিখ ও সময় ঠিক হলে তা সুলতানকে সময়মত জানিয়ে দেবে।

সে রাতে গুমাস্তগীনের মহলে আনতানুসের ডিউটি ছিল না, কিন্তু ফাতেমার সাথে দেখা করার জন্য সে ছিল পেরেশান। ফাতেমা তার কাজে যথেষ্ট সাফল্য দেখিয়েছে। প্রতিদিন রাতেই বাগানে ওদের দেখা হতো। নিয়মিত খবর পেতো আনতানুস। কিন্তু এ সপ্তাহে তার ডিউটি পড়েছে দিনে। ফলে রাতের বেলা ফাতেমার সাথে দেখা করা মুস্কিল হয়ে গেল তার জন্য।

আনতানুস থাকতো কেল্লার বাইরে তাদের জন্য নির্দিষ্ট গার্ডরুমে। ফটক হয়ে রাতে কেল্লায় প্রবেশের কোন সুযোগ ছিল না তার। অন্য দিকে কেল্লার দেয়াল ছিল খুবই উঁচু। সে দেয়াল টপকে কেল্লায় প্রবেশও খুব সহজসাধ্য ছিল না।

বাইরে থেকে যদিও বুঝার কোন উপায় ছিল না, কিন্তু ভেতরে ভেতরে তার পেরেশানী বেড়েই চলছিল। একদিকে দায়িত্ব পালনের অনুভূতি, অন্যদিকে ভালবাসার টান, কোনটাই তার কাছে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

একই রকম অস্থিরতায় ছিল ফাতেমাও। সে আনতানুসের কাছে খবর পাঠালো, 'রাতের নির্দিষ্ট সময়ে বাগানে চলে এসো। জানি, প্রধান ফটক দিয়ে আসতে পারবে না। সে জন্য বাগানের পেছনে দেয়ালের পাশে যে উঁচু গাছ আছে, তার অন্ধকারে চলে এসো। ওখানে দেয়ালের বাইরে রশি ঝুলানো থাকবে, সে রশি বেয়ে চলে আসবে বাগানে।'

দিন গড়িয়ে রাত এলো। মহলে আজ বিরাট ও জমজমাট

মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে।
গুমাস্তগীন এমন সব বড় বড় মেহমানদের আমন্ত্রণ জানিয়েছে, যারা যুদ্ধের সময় কোন না কোন ভাবে তার সাহায্যে আসবে। এদের মধ্যে খৃস্টান সামরিক কমাণ্ডার যেমন আছে, তেমনি আছে মুসাল থেকে আগত কয়েকজন মুসলমান সামরিক অফিসার, যারা গোপনে তাকে সমর্থনের আশ্বাস দিয়েছিল। গুমাস্তগীন কিছু বেসামরিক লোককেও দাওয়াত করেছিল, এদের কাছে ছিল অঢেল অর্থ-সম্পদ।
এদের সবার সাথেই গুমাস্তগীন বেশ আন্তরিক ও সুসম্পর্ক গড়ে তুলেছিল। যুদ্ধের সময় এরা সবাই যে তাকে সাহায্য করবে এতে তার কোন সন্দেহ ছিল না।
মাহফিল এখনো শুরু হয়নি, জলসায় এসে উপস্থিত হলো সেনাপতি শামস বখত ও সেনাপতি সাদ বখত। তাদের সঙ্গে প্রবেশ করলো গুমাস্তগীনের প্রধান বিচারক কাজী ইবনুল খাশিব আবুল ফজল।
ফাতেমার জন্য আজকের জলসা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মাহফিলের মর্ম এখন সে বুঝতে পেরেছে।
সে তার মর্জি ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে চমৎকার সাজগোজ করলো। এমনিতেই সে ছিল অসম্ভব রূপসী। তার রূপ ও যৌবন পুরুষের চোখগুলোকে আকর্ষণ করতো চুম্বকের মত। সাজগোজের পর তাকে মনে হচ্ছিল বেহেশতের হুর-পরী।
মাহফিলে সে রূপের বন্যা বইয়ে দিল। যেখানে উচ্চপদস্থ খৃস্টান ও মুসলিম সামরিক অফিসাররা বসেছিলো, সেও গিয়ে

বসলো তাদের পাশে। ওখানে বসে উৎকর্ণ হয়ে তাদের আলাপ আলোচনা শুনতে লাগলো।
মদ পরিবেশন শুরু হলে লোকজন ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিভিন্ন জায়গায় জটলা করে মদ পান করতে লাগলো। সেও ঘুরে ঘুরে এ জটলা ও জটলা সব জায়গায় ঢু মারতে লাগলো। কারো সাথে হেসে কুশল বিনিময় করলো, কারো সাথে দাঁড়িয়ে এটা ওটা নিয়ে আলাপ করলো। সে এমনভাবে জায়গা বদল করতো ও কান পেতে কথা শুনতো, যাতে কারো কোন সন্দেহ না হয়।
ঘুরতে ঘুরতে সে শামস বখত ও সাদ বখতের কাছে চলে এলো। তাঁরা তাকে সতর্ক থাকার উপদেশ দিয়ে বললো, 'কোন গোপন তথ্য পেলে আমাদের জানিয়ে দিও। আনতানুসের সাথে বেশী সাক্ষাৎ করতে যেও না।'
কিন্তু সে যে আনতানুসকে আজ রাতেই আসতে বলেছে এ কথা ওদের কাছে বললো না।
আজকের মাহফিলে বাইরে থেকেও নামকরা নর্তকী আদমানী করা হয়েছিল। মহলেরও সব সুন্দরী নর্তকী, গায়িকা ও তরুণীদের বলা হয়েছিল, মাহফিলের সৌন্দর্য ও আকর্ষণ বৃদ্ধির ব্যাপারে বিশেষভাবে যত্নবান হতে।
এদের পোশাক আশাক ছিল বড় বিচিত্র ধরনের। কেউ আঁটসাট পোশাক পড়ে সারা অঙ্গে ঢেউ তুলে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, কারো পরণে ছিল অতিশয় পাতলা পোশাক, কারো পরণে স্বল্পবাস। যেন যৌবন প্রদর্শনীর হাট বসেছে এখানে।

মেয়েরা কেউ নাচছিল, কেউ গাইছিল, কেউ সঙ্গ দিচ্ছিল মেহমানদের।

অন্দর মহলের মেয়েদের প্রতি নির্দেশ ছিল, তারা যেন অতিথিদের খুশী করতে ও তাদের আদর আপ্যায়ন করতে কোন রকম ক্রুটি না করে।

কেন এবং কি উদ্দেশ্যে এ মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে মেয়েদেরকে সে কথাও বলে দেয়া হয়েছিল। বোতলের পর বোতল উজাড় হচ্ছিল বিদেশী মদ।

ফাতেমা রাজহংসীর মত সাবলীল ভঙ্গিতে ঘুরে বেড়াচ্ছিল আসরময়। মেহমানদের সাথে মেলামেশা করছিল খোলা মনে। তার অভিনয়ে কোন খুঁত ছিল না।

মাহফিলের সৌন্দর্য ও আকর্ষণ বাড়িয়ে তুলছিল নর্তকী ও গায়িকারা। তাদের নুপুর নিক্কন ও সুরের সম্মোহনে মাতোয়ারা হয়ে উঠেছে উপস্থিত লোকজন।

রাত গভীর হলো। তখনো নাচ-গান পুরোদমেই চলছে। ও দেখলো, আনতানুসের আসার সময় হয়ে এসেছে। ফাতেমা ক্রমশ: অধীর হয়ে উঠছে। কারণ আনতানুসকে বেশীক্ষণ বসিয়ে রাখতে গেলে বিপদের সম্ভাবনাই বাড়বে কেবল।

সে সবার অলক্ষ্যে আসর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইল। ইচ্ছা, আনতানুসের সাথে দেখা করেই আবার ফিরে আসবে মাহফিলে।

সন্ধ্যার পরপরই সে এক দাসীকে দিয়ে দেয়ালে রশি ঝুলিয়ে রেখে এসেছিল। আনতানুসকে বলেছিল, দেয়াল সংলগ্ন বড়

গাছের নিচে দাঁড়াতে। রশি বেয়ে দেয়াল টপকে এ গাছের আড়ালেই থাকবে আনতানুস।

ফাতেমা ভেতরে ভেতরে আসর থেকে বেরোনোর জন্য ছটফট করছিল। কিন্তু নারীর স্বাভাবিক অভিনয় গুণ দিয়ে সে তার অস্থিরতা লুকিয়ে রাখছিল।

সে সময় ফাতেমা এক খৃস্টান কমাণ্ডারের সাথে কথা বলছিল। এই খৃস্টান খুব সাবলীল আরবীতে কথা বলছিল ওর সাথে। ফাতেমা সুলতান আইয়ুবীর বিরুদ্ধে তার ক্ষোভ প্রকাশ করল কমাণ্ডারের কাছে। ইচ্ছে, এই ক্রুসেড কমাণ্ডার তার মনের কথা ব্যক্ত করুক তার কাছে।

তার ইচ্ছে সফল হলো, সে বলতে লাগলো, 'তোমার এই ক্ষোভ বেশী দিন থাকবে না। তার পতনের দিন ঘনিয়ে এসেছে।'

তারপর তারা কেমন করে সুলতান আইয়ুবীকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করবে তার এক চিত্তাকর্ষক বর্ণনা দিতে দিতে সে ফাতেমার আরো ঘনিষ্ট হয়ে বসে তার গায়ে হাত দিল।

ফাতেমা তাকে প্রথমে বাঁধা দিল না। কারণ সে মূল্যবান সব তথ্য দিচ্ছিল ফাতেমাকে। খৃস্টান কমাণ্ডার তাকে মাহফিল থেকে সরিয়ে বাইরে নিয়ে গেল। ওরা হাঁটছে আর কথা বলছে। ফাতেমার হাত খৃস্টান কমাণ্ডারের মুঠোয় আবদ্ধ।

ফাতেমা এগুতে চাচ্ছিল না, কিন্তু কমাণ্ডারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহও করতে পারছিল না। সে মৃদু আপত্তি জানালে কমাণ্ডার তা গায়েই মাখলো না। ওকে টানতে টানতে বাগানে

নিয়ে এলো।

বাগানের এক অন্ধকার কোণায় এসে থামলো কমাণ্ডার। ফাতেমা অনুভব করলো, আনতানুস এসে পড়েছে। যদিও ফাতেমা তাকে দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু তার মন বলছে, আনতানুস আশেপাশেই কোথাও আছে এবং ঠিকই তাকে দেখতে পাচ্ছে।

সে এখান থেকে সরে পড়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলো। কমাণ্ডারকে বললো, 'এসো আমরা মাহফিলে ফিরে যাই!'

কিন্তু কমাণ্ডার ফিরে যেতে রাজী হলো না। বললো, 'এতো উতলা হচ্ছো কেন? রাজনীতি ছাড়াও তোমার সাথে আমার গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে। সে কথা বলতেই তো তোমাকে এই নিরিবিলিতে নিয়ে এলাম। আমার কথা, আমার আচরণ নিশ্চয়ই তোমার ভাল লাগবে।'

ফাতেমা এ কথার কোন জবাব দিল না। সে দ্রুত এখান থেকে সরে পড়ার তীব্র তাগাদা অনুভব করছিল, কিন্তু কি বলে কমাণ্ডারকে রাজি করাবে ভেবে পেল না।

কমাণ্ডার তার কাঁধে আলতো চাপ দিয়ে ঘাসের ওপর বসে পড়ে এক রকম জোর করেই তাকেও টেনে পাশে বসিয়ে দিলো। তারপর আবেগতপ্ত কণ্ঠে শুরু করলো তার রূপের আকাশ ছোঁয়া প্রশংসা।

ফাতেমা তাকে বাঁধা দিতে চেষ্টা করলো, কিন্তু কমাণ্ডার তখন মদ ও রূপের নেশায় বিভোর।

সে ফাতেমার শরীরে হাত দিতে চেষ্টা করলো। ফাতেমা

হেসে বললো, 'একটু চিন্তা করো, আমি কেবল এক পরস্ত্রীই নই, এমন এক জনের স্ত্রী, যে এই কেল্লার মালিক। আর যা-ই হোক, তুমি তার ভাগের রসে আঙুল ডুবাতে পারো না !'

'আরে, তেমন আদেশ আছে বলেই না এমন সাহস পাচ্ছি! তুমি যাকে স্বামী বলছো সে কি আসলেই তোমার স্বামী! সে তো স্বামীর পরিচয়ে তোমাদের জোগাড় করে রেখেছে আমাদের জন্যই!'

কমাণ্ডার বললো, 'নিশ্চয়ই ব্যাপারটা তুমিও ভাল করেই জানো, সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীকে পরাজিত করে নিজে বাদশাহ হওয়ার স্বার্থে তার সমস্ত স্ত্রীদেরকে মেহমানদের জন্য, বিশেষ করে আমাদের জন্য আজ রাতে হালাল করে দিয়েছে সে!'

ফাতেমা তখনো তার রাগ ও অস্থিরতা সামলে হেসে বললো, 'সে তো এক নির্লজ্জ ও নিমকহারাম মানুষ!' কারণ সে ঠিকই জানতো, কমাণ্ডার মিথ্যা বলছে না।

কমাণ্ডারও হেসে দিল। বললো, 'তুমি ঠিকই বলেছো, তোমাদের জাতটাই বড় অদ্ভুত। এমন নিমকহারাম জাত পৃথিবীর আর কোথাও আছে কিনা আমার জানা নেই। সামান্য একটু লোভের মুলা, নিজের একটু ব্যক্তিগত স্বার্থ দেখলে যে মানুষ তার ঈমান বিক্রি করে দিতে পারে, নিজের স্ত্রী, মা-মেয়ে বা বোনের ইজ্জত কি তার চেয়েও মূল্যবান? যে তার ঈমানই বিক্রি করে দিতে পারে, বেগমদের ইজ্জত বিক্রি করতে তার বিবেকে বাঁধবে কেন?'

ফাতেমার কাছে এ প্রশ্নের কোন জবাব ছিল না। সে অন্তহীন কষ্ট আর ব্যথা বুকে চেপে স্থির পাথরের মত সেখানে বসে রইল।

কমাণ্ডার বললো, 'তুমি এক নির্বোধ মেয়ে মানুষ। তোমার মালিক তোমাকে আনন্দ স্ফূর্তির অবাধ সুযোগ দিয়ে রেখেছে, তুমি কেন সে আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করবে? তোমাকে সুখী করার সময় তোমার স্বামীর জীবনেও হবে না। তাহলে কেন পৃথিবীর সুখ ও আনন্দ হাতের মুঠোয় পেলে তা তুমি দূরে ছুঁড়ে ফেলবে?'

ফাতেমার অন্তর ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছিল অস্থির যন্ত্রণায়। এমনিতেই আনতানুসের উপস্থিতির কথা মনে করে ঝড় বয়ে যাচ্ছিল তার বুকে। তার ওপর গুমাস্তগীনের এই অমানুষের মত আচরণ তার চিত্তকে ফালা ফালা করে দিচ্ছিল। যদি এই মানুষটার মধ্যে সামান্য আত্ম-সম্মানবোধও থাকতো তবে সে এমন আত্মঘাতি প্রস্তাব দিতে পারতো না মেহমানদের। কমাণ্ডার যেটাকে অবাধ স্বাধীনতা বলছে, সেটা তো স্রেফ আত্মহননের নামান্তর!

আফসোস, সে তার বিয়ে করা স্ত্রীদের খৃস্টান মেহমানদের হাতে তুলে দিয়ে বলছে, 'খবরদার, মেহমান যেন অসন্তুষ্ট না হয়!' গুমাস্তগীন সেই দুরাচারের নাম, যে তার স্ত্রীদের সম্ভ্রমের বিনিময়ে সুলতান আইয়ুবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের সহযোগিতা নিচ্ছে।

ফাতেমা জালে আটকে পড়া ভয়ার্ত হরিণীর মত ছটফট

করছিল। সে এই খৃস্টান কমাণ্ডারের মুখে থুথুও দিতে পারছে না, তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে পালিয়েও যেতে পারছে না। নিজের বোকামীতে সে নিজেই আটকে গেছে।

বেকুবের মত কেন সে আসতে গেল বাগানে? সে স্বেচ্ছায় না এলে এই নির্জন অন্ধকারে কমাণ্ডার কি তাকে জোর করে নিয়ে আসতে পারতো?

এক অবর্ণনীয় অসহায়ত্বে পড়ে গেল ফাতেমা। বুঝতে পারছে না, এখন সে কি করবে? কি তার করা উচিত? কি করলে সে এ মহা সংকট থেকে পরিত্রাণ পাবে?

খৃস্টান কমাণ্ডার তাকে পাশে নিয়ে ঘাসের ওপর বসেছিল। এই মানসিক অস্থিরতার মধ্যে ফাতেমা এমন এক কাণ্ড করে বসলো, যা সে এক মুহূর্ত আগেও চিন্তা করেনি। সে কমাণ্ডারকে সজোরে ধাক্কা মারল। কমাণ্ডার এই ধাক্কা খেয়ে চিৎ হয়ে উল্টে পড়লো।

মেয়েদের মাঝে যখন ঘৃণার প্রকাশ ঘটে তখন তারা ক্ষিপ্ত বাঘিনীর চেয়েও ভয়ংকর হয়ে উঠে। এই খৃস্টানটি ছিল মদে মাতাল। ব্যাপারটাকে সে হাসি তামাশা মনে করলো। ভাবলো, ফাতেমা তার সাথে হাসি-মজাক করছে। সে উল্টে পড়ে শুয়ে থেকেই হো হো করে হাসতে লাগলো।

কাছেই একটি ভারী পাথর পড়েছিল। ফাতেমা তখন হিতাহিত জ্ঞান শূন্য এক উন্মাদিনী। সে ওই পাথরটি উঠিয়ে দু'হাতে মাথার ওপর তুলে খৃস্টান কমাণ্ডারের মুখ লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারলো।

শুয়ে শুয়ে হাসছিল কমাণ্ডার। যেই ভারী পাথরটি তার কপালে গিয়ে পড়লো সঙ্গে সঙ্গে তার হাসি বন্ধ হয়ে গেল। কমাণ্ডারের মাথা ফেটে বেরিয়ে এলো রক্ত, পাশ ফিরে অজ্ঞান হয়ে গেল কমাণ্ডার।

পাথরটি ছুঁড়ে মেরে আর দাঁড়ালো না ফাতেমা, ছুটে মহলে গিয়ে কোন এক কামরার অন্ধকারে ঢুকে পড়ল। ভয়, আতঙ্ক, উত্তেজনা, উৎকণ্ঠা তাকে এমনভাবে চেপে ধরলো, সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে মেঝেতে বসে পড়লো।

মাহফিল তখনও তেমনি জমজমাট। নাচের নুপুর নিক্কন ও গানের সুর ঝংকার তখন তুঙ্গে। নেশার ঘোরে আবোল তাবোল বকছে সব সম্মানিত লোকজন। এ অবস্থায় কে কোথায় খুন হলো, কে জীবিত, কে সুস্থ, কে তার খোঁজ নেয়?

একটুপর চেতনা ফিরে এলো ফাতেমার। মনে পড়লো, গাছের নিচে অন্ধকারে তার জন্য অপেক্ষা করছে আনতানুস।

সে দ্রুত আবার কামরা থেকে বেরিয়ে ছুটলো বাগানের দিকে। আনতানুসের ভালবাসা, দায়িত্বের অনুভূতি, সবকিছু ছাপিয়ে তার কেবলি মনে হতে লাগলো, সে এইমাত্র একটি মানুষকে খুন করে ফেলেছে। আর লাশটি হচ্ছে এক খৃস্টানের।

সে ছুটছিল আর ভাবছিল, গর্ব ভরে সে আনতানুসকে বলবে, 'আনতানুস, আমি আমার সতীত্বকে রক্ষা করতে পেরেছি। সতীত্ব বাঁচাতে গিয়ে আমি এক খৃস্টান কমাণ্ডারকে খুন করে

ফেলেছি!'

কিন্তু কোথায় আনতানুস! নির্দিষ্ট জায়গায় এসে আনতানুসকে না দেখে সে ঘাবড়ে গেলো। তবে কি সে আসেনি? নাকি আমাকে না পেয়ে সে এসে ফিরে গেছে!

সে গাছের পেছনে দেয়ালের কাছে গিয়ে দেখলো, রশিটা বাইরে ঝুলছে না, ঝুলছে ভেতরের দিকে।

রশি ভেতরের দিকে! তার অর্থ আনতানুস এসেছে, এবং এখনো ফিরে যায়নি। যদি সে ফিরে যেত তবে রশিটা বাইরের দিকে ঝুলতো।

কিন্তু কোথায় সে? গাছের গোড়ায় দাঁড়িয়ে আকাশ পাতাল ভাবছিল ফাতেমা। এদিক-ওদিক তাকিয়ে খুঁজছিল আনতানুসকে।

হঠাৎ মনে হলো, ওদিকে, ফুল ঝাড়ের ওপাশে অন্ধকারে একটি ছায়া নড়ে উঠলো।

সে গভীরভাবে তাকিয়ে রইলো সেদিকে। হ্যাঁ, আবারো নড়েছে। তাহলে কি তার চাকরানী এখনো ওখানে অপেক্ষা করছে ওর জন্য?

ফাতেমা আস্তে ডাক দিল চাকরানীর নাম ধরে। চাকরানীর জন্য এই একটু আওয়াজই যথেষ্ট ছিল। সে দৌড়ে এলো ফাতেমার কাছে।

'সর্বনাশ হয়ে গেছে, বেগম সাহেবা!' চাকরানী ফাতেমাকে বললো, 'তাকে আর এখানে খুঁজে পাবেন না। তিনি এসেছিলেন, আমিও তার অপেক্ষায় নীরবে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

আমি তাকে প্রাচীরের উপরে উঠতে দেখলাম। প্রাচীরের ওপর বসে তিনি এপারে রশি ফেললেন এবং রশি বেয়ে নিচে নামতে লাগলেন।
তিনি তখনো মাটিতে পা দেননি, হঠাৎ দু'দিক থেকে দু'জন লোক ছুটে এলো। তিনি ততক্ষণে রশি বেয়ে নিচে নেমে পড়েছেন। আমি তাকে সাবধান করারও সুযোগ পেলাম না।
তারা দু'জন তাকে এমনভাবে চেপে ধরলো, তিনি কিছুতেই তাদের হাত থেকে মুক্ত হতে পারলেন না। লোক দু'জন তাকে দেয়ালের সাথে চেপে ধরে তার হাত-পা-মুখ বেঁধে ফেললো। এরপর উনাকে নিয়ে ওরা অন্ধকারে হারিয়ে গেল।
আমি এত ভয় পেয়েছিলাম যে, অনেকক্ষণ কোন নড়াচড়া করিনি। যখন বুঝলাম লোকগুলো ধারে কাছে নেই, আপনাকে খুঁজতে শুরু করলাম। কিন্তু বাগানে আপনাকে কোথাও দেখলাম না, ওদিকে মেহমানদের ওখানে যাওয়াও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই, আপনার অপেক্ষায় আমি আবার এসে এখানেই লুকিয়ে রইলাম।'
চাকরানীর কথা শুনে ফাতেমার মাথা ঘুরে গেলো। এইমাত্র সে এক খৃস্টান কমাণ্ডারকে খুন করে এসেছে। আনতানুসের কাছে ছুটে এসেছিল একটু শান্তনার আশায়, একটু নিরাপদ আশ্রয়ের আশায়। এখন আনতানুসই গ্রেফতার হয়ে গেছে।
ব্যাপারটা তার কাছে আরব্য উপন্যাসের সেই আলেফ লায়লার ঘটনার মতই অবিশ্বাস্য ও রহস্যময় মনে হচ্ছিল।
ফাতেমা বুঝতে পারছিল না, এখন তার কি করা উচিত।

এখন কি সে রশি বেয়ে পালিয়ে যাবে, নাকি মহলে ফিরে যাবে?

সে গোয়েন্দাদের কাজ করছে ঠিকই, কিন্তু এ কাজের বিপদ ও ঝুঁকি সম্পর্কে তার যেমন কোন ধারনা নেই, তেমনি নেই প্রকৃত ট্রেনিং।

সে ভয় ও আতঙ্কে হতবুদ্ধি হয়ে গাছের নিচে অন্ধকারে নিশ্চল পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইলো।

এক সময় তার মনে পড়ল, মহলের এক মেয়ে তাকে সাবধান করেছিল। এক দেহরক্ষী সিপাহীর সাথে ভালবাসার খেলা শুরু করার ভয়ানক পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করেছিল তাকে।

সেই ভয়ংকর পরিণতি এত তাড়াতাড়ি চলে আসবে, ভাবতে পারেনি ফাতেমা। আনতানুস ধরা পড়ে গেছে। ফাতেমার বদ্ধমূল ধারণা হলো, এখন সেও গ্রেফতার হয়ে যাবে।

হঠাৎ তার চাকরানীর ওপর সন্দেহ হলো। সে-ই গোপনে সংবাদ দিয়ে আনতানুসকে ধরিয়ে দেয়নি তো?

কিন্তু মনের ভাব গোপন রেখে চাকরানীকে বললো, 'রশিটা খুলে কোথায়ও গোপন করার চেষ্টা করো।'

তারপর সে দৌড়ে আবার মহলে ঢুকে গেল। মাহফিলে গিয়ে খুঁজলো সেনাপতি শামস বখত ও সাদ বখতকে।

তখনো মদ ও নাচের আসর জমজমাট। ফাতেমা সেনাপতি সাদ বখতকে দেখতে পেলো এক কোণায় বসে আছে। মাহফিলের অবস্থা দেখে বুঝা যাচ্ছে, খৃস্টান কমাণ্ডারের খুন বা আনতানুসের বন্দী হওয়া, কোন খবরই এখনও জানাজানি

হয়নি।

সে ধীরে ধীরে ও ভয়ে ভয়ে সাদ বখতের পাশে গেল এবং তাকে ইঙ্গিতে ডাকলো। বারান্দার এক অন্ধকার কোণে গিয়ে দাঁড়ালো ওরা।

ওকে নিরালায় পেয়েই ফাতেমা কোন রকমে শুধু উচ্চারণ করলো, 'আমি এক খৃস্টান কমাণ্ডারকে খুন করে ফেলেছি।' তারপর সে খুন করার কারণও তাকে বললো, কিন্তু আনতানুসের গ্রেফতারের খবর বলার আগেই সাদ বখত বলে উঠলো, 'খৃস্টান কমাণ্ডারের সাথে বাগানে যেতে কেউ তোমাদের দেখেছে?'

'না, তবে যেখানে তার লাশ পড়ে আছে, বাগানে কেউ গেলেই দেখতে পাবে।'

বিপদ কতটা ভয়ংকর বুঝতে পারলো সেনাপতি। ভয়ের এক অজানা শিহরণ বয়ে গেলো তার সারা অঙ্গে। এ মেয়ের এখনি ধরা পড়ে যাওয়ার আশঙ্কায় চিন্তিত হয়ে পড়লো সাদ বখত। বললো, 'তোমার আর এখানে থাকা নিরাপদ নয়। তুমি গ্রেফতার হয়ে গেলে গুমাস্তগীন তোমার মত সুন্দরী মেয়েকে কারাগারে কি শাস্তি দেবে, আমি তা ভাল করেই জানি। যদি তার বাবাও মারা যেতো তবু সে এতটা ক্ষিপ্ত হতো না, যতোটা ক্ষিপ্ত হবে এক খৃস্টান কমাণ্ডার খুন হয়েছে শুনলে। সে এমন কঠিন প্রতিশোধ নেবে, যা তুমি কল্পনাও করতে পারো না।'

'এখন উপায়! আমি এখন কি করবো, কোথায় যাবো?'

ফাতেমা ভয়ার্ত কণ্ঠে বললো।

সাদ বখত বললো, 'আমার ভাই শামস বখত এলে তার সাথে আলাপ করে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবো।'

'তিনি কোথায়?' ফাতেমা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললো।

'তিনি কারাগারে গেছেন। কিছুক্ষণ আগে বাগানের পেছনের দেয়াল টপকে কে যেন ভেতরে এসেছিল। কে এসেছিল জানা যায়নি, কেন এসেছিল, তাও জানা যায়নি।'

'সেনাপতি শামস বখত কি তাকেই দেখতে গেছেন?'

'হ্যাঁ, বন্দীকে জেরা করে তার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফিরে আসবেন তিনি। যদি তিনি কিছুক্ষণের মধ্যে না আসেন, তবে আমি নিজেই তার কাছে চলে যাবো। ভয় পেয়ো না, মনকে শক্ত করো, তোমাকে লুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা আমরাই করবো।'

ফাতেমা নিশ্চিত, গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তি আনতানুস ছাড়া আর কেউ নয়। তার একটাই ভরসা, আনতানুস সেনাপতি শামস বখতের হাতে পড়েছে। নিশ্চয়ই তিনি তাকে বাঁচাতে চেষ্টা করবেন।

আসলেও সে আনতানুসই ছিল। তাকে যে দুই সিপাহী গ্রেফতার করেছে তারা শামস বখতের বিভাগেরই সৈন্য ছিল। তবে তারা যেমন তাদের সেনাপতির আসল পরিচয় জানতো না, তেমনি আনতানুসের পরিচয়ও জানা ছিল না তাদের। তাই তাকে গ্রেফতার করেই তারা সেনাপতিকে এ খবর পৌঁছে দিল।

খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে সেনাপতি শামস বখত বাইরে এলেন। বাইরে এসে তিনি দেখতে পেলেন, আনতানুস ধরা পড়েছে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, আসামী দেয়াল টপকে ভেতরে এসেছে।

অপরাধীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা দরকার। তিনি আসামীকে জেরা করার জন্য এক কামরায় নিয়ে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি তো সম্ভবত রক্ষী বাহিনীর এক সৈনিক। তুমি কেন দেয়াল টপকাতে গেলে? সত্যি কথা বলো, নইলে তোমার মৃত্যুদণ্ড কেউ ঠেকাতে পারবে না।'

আনতানুস নীরবে দাঁড়িয়ে ছিল। সেনাপতি শামস বখতের রাগ হচ্ছিল এ জন্য যে, তাকে তিনি বারবার সাবধান করে দিয়েছিলেন, সে যেন সতর্ক থাকে। দায়িত্ববোধের ওপর যেন অন্য কোন কিছু প্রাধান্য না পায়। ফাতেমার সাথে যেন বেশী দেখা করার চেষ্টা না করে। কিন্তু সে তার নির্দেশ মানেনি। তার নির্দেশ মানলে এখন আর তাকে ধরা পড়তে হতো না। গোয়েন্দা বিভাগের আইনে এটা খুবই অন্যায় কাজ। কিন্তু এখন তাকে এ অপরাধের শাস্তি দেয়ার সময় নয়।

আগে তাকে এ বিপদ থেকে বাঁচাতে হবে। আর তাকে বাঁচাতে হলে তাকে এখান থেকে সরাতে হবে। শামস বখত ভাবছিলেন, এই সাথে ফাতেমাকেও সরাতে হবে। কারণ আনতানুস যে ফাতেমার কাছেই যাচ্ছিল এবং ফাতেমাই তার ভেতরে আসার সুবিধার জন্য রশি টানানোর ব্যবস্থা করেছিল, এ কথা গোপন থাকবে না।

সেনাপতি শামস বখত দু'জন সিপাইকে ডেকে বললো, 'বন্দীকে আরো জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে। ওকে আমার নিজস্ব টর্চার সেলে নিয়ে যাও।'

সিপাইরা তাকে নিয়ে শামস বখতের টর্চার সেলের দিকে রওনা হলো।

সিপাইরা সরে যেতেই তিনি তাঁর বিশ্বস্ত বডিগার্ডদের ডেকে কিছু গোপন নির্দেশ দিলেন। বডিগার্ডরা তার নির্দেশ মত কাজে লেগে গেল।

শামস বখত মাহফিলে ফিরে তাঁর ভাই সাদ বখতকে ডাকলেন। তখনও পুরোদমে নাচ-গান চলছে। মেহমানরা আনন্দে 'সাবাস! সাবাস!' করছে। মদও পরিবেশন চলছে সমানে। সকলেই পান ভোজনে মত্ত। খৃস্টান কমাণ্ডারের লাশটি তখনো পড়ে আছে আগের জায়গাতেই।

এমনি এক পরিবেশে শামস বখত ও সাদ বখতের মধ্যে আলোচনা হচ্ছিল। সাদ বখত তার ভাই শামস বখতকে বললেন, 'ফাতেমা এক খৃস্টান কমাণ্ডারকে হত্যা করে ফেলেছে!'

তিনি ফাতেমাকে কাছে ডেকে দ্রুত নিজের কামরা থেকে পোশাক পাল্টে আসতে বললেন। বললেন, 'তোমাকে এখুনি এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। জমকালো পোশাক নয়, খুব সাদামাটা পোশাক পরে আসবে, যাতে বেরিয়ে যাওয়ার সময় তোমাকে চিনতে না পারে এবং সন্দেহ না করে।'

ফাতেমা চারদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে আস্তে বেরিয়ে গেল কামরা

থেকে।

কিছুক্ষণ পর দারোয়ান এসে সেনাপতি শামস বখতকে সংবাদ দিল, 'বাইরে এক কমাণ্ডার দাঁড়িয়ে আছে।'

শামস বখত আবার বাইরে গেলো। সেখানে এক কমাণ্ডার ভীত সন্ত্রস্ত ভাবে দাঁড়িয়েছিল। সে রিপোর্ট দিল, 'আনতানুস নামে যে রক্ষীটি ধরা পড়েছিল সে পালিয়ে গেছে।'

'কেন সেই দুই সিপাহী কি মারা গেছে, যাদের কাছে আমি তাকে রেখে এসেছিলাম?' শামস বখত ধমকে উঠলেন।

'মনে হচ্ছে ব্যাপারটির সাথে একা আনতানুস জড়িত নয়, তার সাথে আরও কিছু লোকের যোগসাজস আছে।' কমাণ্ডার বললো, 'দুই সিপাইকে আমরা কারাগারের পথে বেহুশ অবস্থায় পেয়েছি। তাদের মাথায় আঘাতের চিহ্ন।'

সেনাপতি শামস বখত ঘটনা সরেজমিনে দেখতে গেলেন। ততক্ষণে সিপাহীদের জ্ঞান ফিরে এসেছিল। তারা বললো, 'আমরা বন্দীকে নিয়ে যাচ্ছিলাম, অন্ধকারে কে বা কারা আমাদের পিছন থেকে মাথায় আঘাত করলো। আমরা বেহুশ হয়ে পড়ে গেলাম।'

সেনাপতি শামস বখত তাড়া দিলেন উপস্থিত অন্যান্য সৈনিকদের, 'দেখছো কি দাঁড়িয়ে! বন্দী নিশ্চয়ই পালিয়ে বেশী দূর যেতে পারেনি। খোঁজো, চারদিকে খুঁজে দেখো কোথায় পালিয়েছে বন্দী।'

সৈনিকদের মাঝে দৌড়াদৌড়ি পড়ে গেল।

ঠিক সেই সময় একজন মহিলা আপাদমস্তক কালো বোরকা

পরে বেরিয়ে এলো গুমাস্তগীনের মহল থেকে।
দরজার প্রহরীরা তাকিয়েছিল তার দিকে, কিন্তু মহিলার চোখ দু'টি ছাড়া ওরা আর কিছুই দেখতে পেলো না। মহিলাটি দরজার বাইরে এসেই অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।
প্রহরীরা জানতো, আজ জবরদস্ত মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে মহলে। অতএব চেনা অচেনা বহু মেহমান রাতভর আসা-যাওয়া তো করবেই। সুতরাং কে এলো আর কে গেল এ নিয়ে তাদের কোন মাথাব্যথা ছিল না।

রাতের শেষ প্রহর।
মেহমানদের এবার বিদায়ের পালা। অলস পায়ে মহল থেকে একে একে বেরিয়ে আসতে লাগলো মেহমানরা। প্রহরীরা কেল্লার প্রধান ফটক উন্মুক্ত করে দু'পাশে দাঁড়িয়ে গেল, যেন মেহমানরা সচ্ছন্দে বেরিয়ে যেতে পারেন।
প্রাসাদের বাইরে কেল্লার চার দেয়ালের ভেতরেই ছিল মেহমানদের ঘোড়া ও ঘোড়ার গাড়ি রাখার স্থান। সেখান থেকে নিজের বাহন নিয়ে কেউ বেরোচ্ছিলেন ঘোড়ায় চড়ে, কেউবা ঘোড়ার গাড়ীতে চড়ে।
একে একে বের হচ্ছেন মেহমানরা, প্রহরীরা দেখলো দুই অশ্বারোহী এগিয়ে আসছে ফটকের দিকে, তাদের একজনের মুখ ঢাকা, অন্য ঘোড়ায় বোরকাপরা এক মহিলা আরোহী। একটু আগে এ মহিলাই গুমাস্তগীনের মহল থেকে বের হয়ে এসেছিল।

এ দুই অশ্বারোহী ছিল আনতানুস ও ফাতেমা। এদের এভাবে পালাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন সেনাপতি শামস বখত ও সাদ বখত।

তিনিই বন্দীকে কারাগারে নিয়ে যাওয়ার হুকুম দিয়ে তার বিশ্বস্ত বডিগার্ডদের বলেছিলেন, কিভাবে আনতানুসকে মুক্ত করবে। তার নির্দেশেই বডিগার্ডরা দুই সিপাইকে আহত করে আনতানুসকে মুক্ত করে।

ফাতেমা প্রাসাদ থেকে সফলভাবে বেরিয়ে এলে শামস বখত ও সাদ বখতের বিশ্বস্ত বডিগার্ড, যারা মূলত সুলতান আইয়ুবীর গোয়েন্দা ছিল, তারা আনতানুস ও ফাতেমাকে একত্রিত করে সেখান থেকে তাদের পালিয়ে যাওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা সম্পন্ন করে।

রাতটি মদ ও নাচ-গানে বিভোর হয়ে কেটে গেলেও পরদিন ভোরেই গুমাস্তগীনের কাছে পৌঁছলো এক দুঃসংবাদ। মহলের এক রক্ষী তাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে জানালো, 'বাগানে এক খৃস্টান কমাণ্ডারের লাশ পড়ে আছে।'

মুহূর্তে ঘুমের আমেজ ও অলস তন্দ্রার ভাব কেটে গেল গুমাস্তগীনের।

সে অবিশ্বাস ভরা চোখে প্রহরীর দিকে তাকিয়ে বললো, 'কি আবোল তাবোল বকছো! আমার মহলে একজন খৃস্টানকে খুন করতে যাবে কে? কার এমন বুকের পাটা? কে সেই খুনী?'

গুমাস্তগীনের চেহারা যখন রাগে লাল সে সময় মহলের

আরেক গার্ড এসে বললো, 'রক্ষী আনতানুস পালিয়েছে। তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।'
এ সময় এক দাসী ছুটে এসে বললো, 'হুজুর, আপনার ছোট বেগম ফাতেমা মহলে নেই। ঝাড়ুদার তার কামরা পরিষ্কার করতে গিয়ে দেখে তিনি কামরায় নেই। সারা বাড়ি ঝাড়ু দেয়া শেষ করে কোথাও তাকে না দেখে আমাদের বলে। তখন আমরা বাড়ির প্রতিটি কামরায় তাকে তালাশ করি। কিন্তু কোথাও তিনি নেই।'
গুমাস্তগীনের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো। প্রায় একই সময়ে ঘটে যাওয়া তিনটি মারাত্মক দুর্ঘটনার মধ্যে কোন যোগসূত্র আছে কিনা এখনো তার জানা নেই, কিন্তু তার মনে হলো, এর মধ্যে কোন যোগসূত্র না থেকেই পারে না।
একই দিনে খৃস্টান কমাণ্ডারের খুন হয়ে যাওয়া, রক্ষীর পলায়ন ও স্ত্রীর নিখোঁজ সংবাদের মধ্যে কি রহস্য লুকিয়ে আছে তাকে খুঁজে বের করতে হবে।
তিনি দ্রুত উপস্থিত এক গার্ডকে বললেন, 'রক্ষী প্রধান ও সেনাপতিকে খবর দাও জলদি এখানে আসার জন্য।'
তারপর তিনি পোশাক পাল্টাতে নিজের রুমে গিয়ে ঢুকলেন। একটু পর সামরিক পোশাকে বৈঠকখানায় এসে দেখেন সেনাপতি শামস বখত, সাদ বখত ও রক্ষীপ্রধান বসে আছে।
তিনি বললেন, 'এসব কি শুনছি? আপনারা কি গতকালের দুর্ঘটনা সম্পর্কে কিছু শুনেছেন?'
এরপর উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে ওদের মাঝে বিস্তারিত আলাপ

হলো। সবকিছু শুনে তিনি আদেশ জারী করলেন, 'যে দু'জন সিপাহীর অসতর্কতার কারণে রক্ষী পালিয়ে যেতে সক্ষম হলো তাদের দু'জনকে সারা জীবনের জন্য কারাগারে পাঠিয়ে দাও। আর খৃস্টান কমাণ্ডারকে কে খুন করলো এবং ফাতেমা কেন এবং কোথায় পালিয়ে গেল জলদি তা অনুসন্ধান করে বের করো।'

গুমাস্তগীনের এক খৃস্টান বন্ধু খুন হয়ে গেছে, ব্যাপারটা নিয়ে হৈ চৈ কাণ্ড পড়ে গেল। আনতানুস ও ফাতেমার পালানোর ব্যাপারটাও আলোড়ন তুললো, তবে তা মহলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল। মহলের বাইরে এ নিয়ে আর তেমন কেউ মুখ খুললো না।

গুমাস্তগীন বন্ধুর খুন হওয়া নিয়ে বাইরে যত দু:খ প্রকাশ ও প্রোপাগাণ্ডা করছিল, সত্যি কথা বলতে কি, মনে মনে ততটা আফসোস ও দুঃখ তার হয়নি। কারণ এই কমাণ্ডার কেবল চাটুকারই ছিল না, মহা ধড়িবাজও ছিল। সে গুমাস্তগীনকে ফুসলিয়ে তার কাছ থেকে বেশী বেশী সুবিধা আদায় করতো। সব কাজেই সে অতি উৎসাহ দেখাতো এবং বাড়াবাড়ি করতো।

খৃস্টানেরা ভালমতই জানতো, মুসলমানদের হেরেমখানায় আরব্য উপন্যাসের মত কাহিনী প্রায়ই তৈরী হয়। সেখানে মেয়েদের অদৃশ্য হয়ে যাওয়া, নারী ঘটিত কারণে রহস্যজনক খুন, এ সবই স্বাভাবিক ঘটনা। সবাই ধরে নিল, কমাণ্ডারের

মৃত্যু সে রকমই একটি ঘটনা। কিন্তু ব্যাপারটা নিয়ে গুমাস্তগীনকে একটু চাপের মুখে রাখার এই সুযোগ ওরা হাতছাড়া করবে কেন? ওরা এ ঘটনার বিচার ও ক্ষতিপূরণ দাবী করলো। ওদের এই চাপের কারণে গুমাস্তগীন একটু অসহায় অবস্থায় পড়ে গেল। ওরা চাচ্ছিল, সে যেন তার মাথা ওদের পায়ের নিচে রেখে দেয়। আইয়ুবীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে গুমাস্তগীন যাদের সাহায্য চেয়েছিল ওরা এমন সব শর্ত আরোপ করলো, তা মানতে গেলে তাকে ওদের গোলাম হয়ে যেতে হয়। গুমাস্তগীন বুঝতে পারলো, খৃস্টানদের নিয়ত মোটেই ভাল নয়। এসব ঘটনা ও অবস্থার প্রকৃত রূপটা আর গোপন রইল না। হলব পর্যন্ত পৌঁছে গেল এ খবর।

সেখানকার আমীর উমরা ও পারিষদবর্গ, যারা সুলতান আইয়ুবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল, তারা গুমাস্তগীনকে তাদের ঐক্যজোটে শামিল ও সক্রিয় দেখতে চাচ্ছিল। স্বাধীনভাবে লড়ার চেয়ে জোটবদ্ধ হয়ে লড়ার গুরুত্ব বুঝানোর জন্য আল মালেকুস সালেহ গুমাস্তগীনের কাছে এক দূত পাঠাল। সেই সাথে প্রথানুযায়ী মূল্যবান উপঢৌকন ও দুই নবীন তরুনী পাঠালো শুভেচ্ছার নিদর্শন স্বরূপ। গুমাস্তগীন আরাম করছিল। দূত উপহার ও মেয়ে দু'টিকে নিয়ে সেনাপতি শামস বখতের সাথে দেখা করল। কারণ গুমাস্তগীনের পরেই এখানকার সর্বাধিক ক্ষমতাধর ব্যক্তি ছিলেন সেনাপতি শামস বখত। তিনি গুমাস্তগীনের পক্ষে সরকারী কাজকর্মও দেখাশোনা করতেন। সেনাপতি শামস বখত মেয়েদেরকে পাশের কামরায় বসিয়ে রেখে দূতকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি সংবাদ নিয়ে এসেছো?' দূত তার সফরের উদ্দেশ্য তুলে ধরলো। তার

হাতে তুলে দিল আল মালেকুস সালেহের দীর্ঘ চিঠি। সেনাপতি শামস বখত চিঠি পাঠ করলেন।

চিঠিতে আল মালেকুস সালেহ উল্লেখ করেছেন, 'সুলতান আইয়ুবী হলব অবরোধ করলে চুক্তি অনুযায়ী রিমাণ্ড খৃস্টান বাহিনী নিয়ে রওনা দিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সুলতান আইয়ুবী অবরোধ উঠিয়ে তার মোকাবেলায় এগিয়ে গেলে সে ভয়ে পালিয়ে যায়। আইয়ুবীর সাথে কোন যুদ্ধ না করেই বিপুল অর্থের বিনিময়ে তার সাথে আমার যে সহযোগিতা চুক্তি হয়েছিল সেই চুক্তি সফল ও শেষ হয়ে গেছে দাবী করে সে আমার এখানে তার যে উপদেষ্টারা ছিল তাদের ফেরত নিয়ে যায়। এভাবে সে আমার বিপুল পরিমাণ অর্থ হাতিয়ে নেয় কিন্তু বিনিময়ে আইয়ুবীর বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধই করেনি।

সুতরাং আইয়ুবীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে খৃস্টানদের সহযোগিতার আশা বৃথা। আমি মনে করি খৃস্টানরা আমাদের কাছ থেকে তাদের স্বার্থ ঠিকই আদায় করে নেবে, কিন্তু আমাদের কোন উপকারে লাগবে না তারা। আগামীতেও তারা আমাদের এমনিভাবে ধোঁকা দেবে। যদি আমরা পৃথক পৃথকভাবে সালাহউদ্দিনের সাথে মোকাবেলা করি, তবে সামরিক বিবেচনায় আমাদের কারোরই বিজয়ের নিশ্চয়তা নেই। দুর্ভাগ্যজনক পরাজয়ের গ্লানি থেকে বাঁচতে হলে, আমি মনে করি আমাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। কেবলমাত্র ঐক্যবদ্ধ অভিযানই সুলতান আইয়ুবীকে চিরদিনের মত নিঃশেষ করার গ্যারান্টি দিতে পারে।' এই চিঠির সাথে কিভাবে যৌথ অভিযান পরিচালিত হতে পারে তার একটি বিস্তারিত পরিকল্পনা ছিল। পরিকল্পনাটি এ রকম, 'আর রিস্তানের

পাহাড়ী এলাকার বরফ গলতে শুরু করেছে। গোয়েন্দারা জানিয়েছে, পাহাড়ের যে উঁচু শৃঙ্গে সুলতান আইয়ুবী গাঁট হয়ে বসেছিল, ওখানকার বরফ গলতে শুরু করায় বেকায়দায় পড়ে গেছে সুলতানের বাহিনী। বরফের মাঝে সৃষ্টি হচ্ছে ফাটল। বরফগলা পানির স্রোত সৃষ্টি হচ্ছে, সেই স্রোত নামতে শুরু করেছে নিচের দিকে। ফলে পাহাড়ের চেহারা যাচ্ছে পাল্টে। সৈনিকরা এক জায়গায় বসতে পারছে না। পায়ের নিচের মাটি কাঁপছে তাদের। এটাই সুলতানকে আক্রমণ করার মোক্ষম সময়। আমাদের জন্য এক মহা সুযোগ। আমরা সবাই একজোট হয়ে সম্মিলিত বাহিনী নিয়ে আইয়ুবীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে তারা এক মস্ত ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে যাবে। চারদিক থেকে পাহাড়গুলো ঘিরে রাখলে আমরা অবরোধের মধ্যে ফেলেই ওদের পরাজিত করতে পারবো।

আরেকটি বিষয়, খৃস্টান রাজা রিজনেল্টকে আমাদের সাথে শামিল করে নেয়ার জন্যও আমি একটি উদ্যোগ নিয়েছি। আপনিও সেইসব খৃস্টানদের সহযোগিতা আদায়ের চেষ্টা করুন, যাদের আপনি যুদ্ধবন্দী হিসাবে কারাগারে পঁচে মরার হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। নূরুদ্দিন জঙ্গীর মৃত্যুর পর ওদের শর্তহীন মুক্তি দিয়ে আপনি যে নজীর সৃষ্টি করেছিলেন, সে কথা ওদের স্মরণ করিয়ে দিন।' সেনাপতি শামস বখত এই চিঠি তার ভাই সাদ বখতকে পড়তে দিলেন। চিঠি পড়া শেষ হলে দুই ভাই পরামর্শ করলেন, এখন কি করা যায়।

সাদ বখত বললো, 'এ চিঠি গুমাস্তগীনের কাছে পৌঁছানো ঠিক হবে না। আলাদা আলাদা মোকাবেলা করলে সুলতানের কোন কষ্টই হবে না ওদের পরাজিত করতে। কিন্তু সম্মিলিত

আক্রমণ ঠেকাতে মুজাহিদদের যথেষ্ট বেগ পেতে হবে।'
'তুমি ঠিকই বলেছো।' সেনাপতি শামস বখত বললেন, 'সুলতানের সাথে এখন যথেষ্ট পরিমাণ সৈন্য নেই। এ অবস্থায় তাঁকে সম্মিলিত আক্রমণের ঝুঁকিতে পড়তে দেয়া যায় না।' এভাবে অনেক চিন্তা-ভাবনার পর তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলো, এ চিঠি তারা গুমাস্তগীনের কাছে পৌঁছতে দেবে না। গুমাস্তগীন সুলতান আইয়ুবীর সাথে একাই যুদ্ধ করবে। এতে তার পরাজয় হবে নিশ্চিত। এভাবেই তারা গাদ্দারদের একে একে নিঃশষ করার পরিকল্পনা করলো। দুই ভাই তাদের এই একান্ত গোপন পরিকল্পনা নিজেদের অন্তরেই লুকিয়ে রেখেছিল কিন্তু একটি ঘটনা তাদেরকে এ ব্যাপারে আবেগ তাড়িত করে তুললো। এই আবেগ সিঞ্চনে মুখ্য ভূমিকা পালন করলো দূতের নিয়ে আসা সেই দুই মেয়ে।
মেয়েরা জানালো, তারা দু'জনই মুসলিম পরিবারের মেয়ে। বয়সের দিক থেকে ওরা ছিল খুবই অল্প বয়সের, সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ দুই নবীন তরুণী। তাদের দেখে দুই ভাইয়েরই খুব মায়া হলো। বুকের ভেতর বয়ে গেল কষ্টের বিদ্যুৎ।
হায়! মুসলমানদের আজ একি অধপতন! ফুলের মত নিষ্পাপ দুটি মেয়েকে এই পাপের পথে ঠেলে দিতে একটুও কাঁপলো না বাপ-মায়ের বুক! কেমন করে তারা পারলো নিজের মেয়েদেরকে অধ:পতনের এই পঙ্কিল আবর্তে ঠেলে দিতে!
যারা নিজের সুন্দরী মেয়েদের ইজ্জত বিক্রি করতে পারে, নিজেদের চরিত্র ও ঈমান তো তারা আগেই বিক্রি করে ফেলে! এ সব অবলা সুন্দরী মেয়েদের যেখানে সম্মানিত ও ভদ্র ঘরের বধূ হয়ে সম্মানের জীবন কাটানোর কথা, লোভী

পিতামাতার ইচ্ছার বলী হয়ে আজ তারা বিক্রি হয়ে যাচ্ছে! নিজের ইচ্ছা ও স্বপ্ন জলাঞ্জলি দিয়ে ধনীদের অন্দর মহলে দাসী হিসেবে নিকৃষ্ট জীবন যাপনে বাধ্য হচ্ছে!

'তোমরা কোথাকার বাসিন্দা?' সাদ বখত তাদের জিজ্ঞেস করলো, 'এদের হাতে কেমন করে পড়লে?' মেয়েরা যে উত্তর দিল তাতে দুই ভাইয়েরই শরীরের রক্ত গরম হয়ে উঠলো।

সেনাপতিদ্বয় জানতো, খৃস্টান অধ্যুষিত অঞ্চলে মুসলমানদের ইজ্জত ও সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকার কোন উপায় ছিল না। নিরাপদ ছিল না মেয়েদের মান-সম্ভ্রম। খৃস্টানদের নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে মুসলমানরা তাদের চিরদিনের সাজানো ঘরবাড়ি ছেড়ে পথে নামতো নিরাপদ আশ্রয়ের আশায়। কিন্তু পথও তাদের জন্য নিরাপদ ছিল না। তারা যখন অন্যত্র যাওয়ার জন্য যাযাবরের মত পথে নামতো তখন সে কাফেলায় হামলা করে তাদের সব সহায় সম্পদ লুট করে নিত খৃস্টানরা। এমনকি দলে যে সব যুবতী মেয়ে থাকতো, তাদেরও অপহরণ করতো। এই লুটতরাজ সংঘবদ্ধ খৃস্টান যুবকরা শুধু করতো এমন নয়, বহু ক্ষেত্রে সে সব অঞ্চলের খৃস্টান সেনাবাহিনীও এ ধরনের লুটপাটে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতো। লুটের মালের মধ্যে থাকতো ধন-সম্পদ, থাকতো সুন্দরী যুবতী নারী, আর থাকতো কাফেলার উট, ঘোড়া ও পশুর পাল।

এসব উট, ঘোড়া ও পশুর পাল তারা বাজারে নিয়ে বিক্রি করে দিত। মেয়েদেরও বাজারে নিয়ে চড়া দামে নিলামে তুলতো। এদের কিনে নিত ধনাঢ্য খৃস্টানরা। কখনো কখনো মুসলমান আমীররাও খরিদ করতো এসব মেয়েদের।

খৃস্টান সৈন্যরা যেসব মেয়েদের লুট করতো তাদের

অধিকাংশকে তারা পতিতা ও গোয়েন্দা বানাতো। চরিত্র হনন ও গোয়েন্দা কাজের প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের পাঠিয়ে দিত মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায়। ওখানকার আমীর ওমরা ও যুবকদের নষ্ট করার কাজে ব্যবহার করা হতো ওদের।

এই দু'টি মেয়েকে এমনি এক কাফেলা থেকে লুট করা হয়েছিল। তখন তাদের বয়স ছিল একজনের নয়, অন্যজনের তের। তারা ফিলিস্তিনের খৃস্টান অধ্যুষিত এলাকা থেকে পরিবারের লোকজনের সাথে নিরাপদ এলাকায় চলে যাচ্ছিল। ওদের কাফেলাটি ছিল বিরাট। খৃস্টান সেনাবাহিনীর একটি দল রাতের বেলায় হঠাৎ ওদের ওপর আক্রমণ করে বসে। কাফেলার রক্ষী যুবকরা ওদের প্রতিহত করার আপ্রাণ চেষ্টা চালায়, কিন্তু একটি সুশিক্ষিত সেনাবাহিনীর সাথে কুলিয়ে উঠতে পারে না। অনেকেই হতাহত হয়। বাকীরা পরাজিত হয়ে ধরা পড়ে সৈন্যদের হাতে। এ সময় অনেক মেয়েই ওদের হাতে ধরা পড়ে, যার মধ্যে এ দু'জনও ছিল। এ মেয়ে দু'টি ছিল অসাধারণ সুন্দরী। সৈন্যরা তাদেরকে ছাউনিতে নিয়ে গিয়ে বিশেষভাবে লালন-পালন করতে থাকে। প্রথম দিকে তাদের ওপর খুব অমানবিক আচরণ করা হয়। বিভিন্ন রকম নিপীড়ন ও নির্যাতন চালানো হয়। তারপর তাদের বলা হয়, 'তোমরা যদি আমাদের কথা মত চলো তবে তোমাদের ওপর আর কোনদিন কোন রকম নির্যাতন করা হবে না।' এরপর থেকে ওদের সাথে সদয় ব্যবহার করা শুরু করে খৃস্টান সৈন্যরা। তাদেরকে নানা রকম শারীরিক ও মানসিক প্রশিক্ষণ দেয়। এক সময় তাদের সাথে এমন আচরণ শুরু করে যেন ওরা রাজকুমারী। দেখতে ওরা শাহজাদীর মতই

সুন্দরী ও রূপসী ছিল। খৃস্টান গোয়েন্দা বাহিনী তাদেরকে রাজকীয় আদব-কায়দা ও প্রটোকল শেখালো। কিভাবে প্রভুদের মনোরঞ্জন করতে হয়, কিভাবে দরবারে মদ পরিবেশন করতে হয় সব বিষয়েই তাদেরকে পারদর্শী করে তোলা হলো। তাদের শিখালো নৃত্য ও গান।পাঁচ বছর পর সুলতান নূরুদ্দিন জঙ্গীর মৃত্যু হলে খৃস্টানরা এ দুই মেয়েকে উপহার স্বরূপ দামেশকে পাঠায়। খলিফা আল মালেকুস সালেহের সাথে ওরা হলব এসেছিল। সেখান থেকে দূতের সাথে ওদেরকে এখানে পাঠানো হয়। মেয়েরা বললো, 'আমাদের মন থেকে ধর্মীয় ও জাতীয় চেতনা একেবারে নি:শেষ করে দেয়া হয়েছে। মানুষ আমাদেরকে সুন্দর খেলার পুতুল মনে করে, আমরা নিজেরাও নিজেদেরকে তাই ভাবতে শুরু করি। কিন্তু যখন আমাদেরকে দামেশক পাঠানো হয় তখন আমাদের মনে নতুন করে ধর্মীয় চেতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। আমাদের মনে পড়ে, আমাদের শরীরে বইছে মুসলমানের রক্ত। মনে পড়ে, আমাদের পূর্ব পুরুষরা একদিন ইসলামের জন্য জীবন দিত, তাদেরই উত্তরসূরী হয়ে আমরা ইসলাম ও মুসলমানদের বারোটা বাজানোর জন্য কাজ করে যাচ্ছি! এ কথা মনে হতেই নিজেদের জীবনের ওপর ধিক্কার নেমে আসে আমাদের। আমরা আমাদের মা-বাবা, ভাই-বোন ও সেই পরিবার আর খুঁজে পাবো না। কিন্তু স্বজাতির কাছে ফিরে এসে আমাদের মনে হলো, আমরা তো এই জাতিরই সন্তান! আমরা মুসলমান আমীর ও শাসকদেরকেই আমাদের মা-বাবা ও অভিভাবক মনে করলাম। কিন্তু আফসোস! এদের কোন একজনের কাছ থেকেও পিতা ও ভাইয়ের আদর ও

আচরণ পেলাম না। খৃস্টানদের কাছে সবকিছু হারিয়েও যে দু:খ বেদনা পাইনি, সেই কষ্ট পেলাম মুসলমান ভাই ও গুরুজনদের কাছে এসে। আমরা তাদের কাছে দু'হাত জোড় করে দয়া ভিক্ষা করেছি; দু'পা ধরে মিনতি করেছি।

দ্বীন ইসলাম, আল্লাহ ও তার রাসূলের দোহাই দিয়ে বলেছি, আমরা আপনাদেরই বোন বা কন্যা! আমরা মজলুম, আমরা লাঞ্ছিত! আমাদেরও মান-সম্মান আছে, আল্লাহরওয়াস্তে আমাদের ওপর রহম করুন! একটু দয়া করুন আমাদের ওপর! কিন্তু তাদের কাছ থেকে খৃস্টানদের মতই বরং কারো কারো কাছ থেকে তার চেয়েও বেশী বিভৎস ও নোংরা আচরণ পেয়েছি। ওরা জঘন্য প্রকৃতির ব্যভিচারী, ভয়ানক মাতাল ও কুৎসিত শয়তানী আচরণে অভ্যস্ত।

ওদের নোংরামী দেখে আমরা বিস্মিত হয়েছি। অনুভব করেছি, এসব মুসলমান আর খৃস্টান কাফেরদের মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই।' ওরা আরো বললো, 'এখন আমাদের চোখের মধ্যে জ্বলছে প্রতিশোধের দাউ দাউ আগুন। সুলতান আইয়ুবী দামেশকে প্রবেশ করলে আমরা খুবই খুশী হয়েছিলাম। খৃস্টান অধ্যুষিত অঞ্চলের মুসলমানরা সুলতান আইয়ুবীর পথপানে উদগ্রীব হয়ে তাকিয়েছিল। তারা তাঁকে তাদের অবিসংবাদিত ইমাম ও নেতা মনে করতো। তিনি যখন সত্যের পতাকা উড়িয়ে দামেশকে পৌছলেন, আমরা স্থির করলাম, আমরা তাঁর কাছে চলে যাবো। তাঁকে বলবো, 'আমাদের মত মজলুম মেয়েদেরকে সামরিক বিভাগে নিয়ে নিন। আমরা এতদিন যে পাপ করেছি, দ্বীনের পথে কাজ করে সে পাপ মোচন করতে চাই।' কিন্তু খলিফা আমাদেরকে জোরপূর্বক হলবে নিয়ে

এলো। আমাদের ভাগ্য আমাদের তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। ওদের হাত থেকে এবার আমরা আপনাদের হাতে এসে পড়েছি। এখন আর আমাদের কোন প্রত্যাশা নেই। আপনাদের কাছে আমরা এমন আশাও করি না, আপনারা আমাদেরকে নিজের বোন বা কন্যার মত গ্রহণ করবেন। কিন্তু একটি কথা আপনাদের বলে দিতে চাই, যে ইজ্জত ও সম্মান হারিয়ে ফেলেছি, তা হয়তো আর ফিরে পাবো না, কিন্তু ইসলামের সাথে আমাদের যে আত্মিক সম্পর্ক রয়েছে তা ফিরে পাওয়ার জন্য আমরা আমৃত্যু চেষ্টা করে যাবো। আমরা খৃস্টানদের কাছে ছিলাম, সেখানে ইসলামের বিরুদ্ধে ও সুলতান আইয়ুবীর বিরুদ্ধে সর্বত্র ষড়যন্ত্রের ভয়াল রূপ দেখেছি। আবার মুসলমানদের কাছে এসেও সেই একই তৎপরতা দেখতে পাচ্ছি। আমাদের রূপ ও যৌবন আপনারা আপনাদের ইচ্ছেমত ব্যবহার করুন, কিন্তু দয়া করে ইসলামের বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্রে আমাদেরকে ব্যবহার করবেন না।'

'কিন্তু তোমাদেরকে যদি ইসলামের পক্ষে গোয়েন্দাগিরি করতে বলি, তাহলে কি তোমরা তা করবে?'

'দেখুন, আপনারা আইয়ুবীর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। ইসলামের জন্যই আইয়ুবী অস্ত্র ধরেছেন বলে আমরা বিশ্বাস করি। ফলে ইসলামের পক্ষে আপনারা আমাদের কাজে লাগাবেন, এটা অবিশ্বাস্য। তবু আপনারা যে প্রশ্ন করেছেন তার উত্তরে বলতে চাই, যদি আপনারা আমাদেরকে খৃস্টানদের এলাকায় পাঠান, আমরা আমাদের দায়িত্ব পালনে মোটেও ত্রুটি করবো না। এখন আমাদের আর ইজ্জত হারানোর ভয় নেই। মান-সম্ভ্রমের প্রশ্ন নেই। যে সম্পদ

হারানোর ভয়ে নারীরা শঙ্কিত থাকে সে সম্পদ তো আমাদের আগেই নিলাম হয়ে গেছে। এখন যদি আমাদেরকে ইসলামের প্রতিরক্ষা ও উন্নতির জন্য কেউ কাজ করার সুযোগ দেয়, তার কাছে আমরা চির কৃতজ্ঞ থাকবো।' মেয়েদের এই তেজোদীপ্ত বক্তব্য ও বেদনাদায়ক কাহিনী শুনে সেনাপতি শামস বখত ও সাদ বখত দু'জনেই মনে মনে কঠিন আঘাত পেলেন। তাঁরা মেয়েদের বললেন, কোন বিলাসপ্রিয় ও স্ফূর্তিবাজ শাসকের হাতে তোমাদের আর তুলে দেয়া হবে না।'

####

পরবর্তী বই ক্রুসেড-১৩

পাপের ফল

আসাদ বিন হাফিজ

প্রকাশন